॥ পিয়াপসন্দ ॥

॥ রমাপদ চৌধুরী ॥

পিয়াপসন্দ্

রমাপদ চৌধুরী

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা ১২ ॥

প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৩৬২
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬৮

প্রকাশক ঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রক ঃ যতীন্দ্রনাথ নিয়োগী
মানস প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৩ সভাবিবিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩।

প্রচ্ছদপট শিল্পী ঃ
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ ঃ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই ঃ ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

আড়াই টাকা

রাণীপসন্দ্ আমের নাম, বেগমপসন্দ্ সাড়ী। রাণীরা সেকালে হয়তো আম পছন্দ করতেন, বেগমরা বেশবাস প্রসাধন। আজকের যুগে প্রিয়ারা পছন্দ করেন মনের প্রসাধন, শুধু শরীরের নয়। আধুনিক প্রিয়াদের পছন্দসই বারোটি গল্প একত্রিত হলো, 'পিয়াপসন্দ্' গ্রন্থে। এর মধ্যে কয়েকটি গল্প একেবারে হাল আমলের লেখা, কয়েকটি বেশ পুরোনো। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য 'অভিসার রঙ্গনটী' থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে কয়েকটি, বইটির কোন নতুন সংস্করণ সে-কারণেই প্রকাশ করা হবে না। পিয়াপসন্দের প্রায় সব গল্পই শহর পরিবেশের, স্থান-কাল পাত্র আধুনিক ও শহুরে।

এই লেখকের

লালবাঈ

দরবারী

প্রথম প্রহর

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু,

সূচীপত্র

ত মো গা হ ন

কালা ঘটক আসলে কালা নয়, কালো।

কর্পোরেশনের খাতায় যে নামই থাক, রামী ধোপানীর গলি বললে যে কেউ দেখিয়ে দিতে পারতো। এ পাড়ার যে কেউ। সরু আর নোংরা একটা কানা গলি, বড়ো রাস্তা থেকে নেমে মেজো সেজো নানান পথ ঘুরে ঢুকতে হয় গলিটায়, আর বেরুতে হলেও সেই একই মুখে। কারণ আর একটা দিক পুরোনো পচাধসা একটা বাড়ীর দেয়াল চাপা পড়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল।

গলিতে ঢুকতেই পর পর গোটাকয়েক চালাঘর, ধোপাদের আড্ডা। ময়লা আর ধোপদুরস্ত কাপড়ের রাশ থেকে ভেসে আসতো একটা বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ। চালার বাইরে সারি দেয়া গোটাকয়েক বড়ো বড়ো উনোন, আগুন থাক বা না থাক, তার ওপর সদাসর্বদা চাপানো থাকতো আধ ডজন ইস্ত্রি। এনামেলের থালায় গোটা গোটা শুকনো ভাতের রাশ, আর নয়তো এটা ওটা নিয়ে জটলা পাকিয়ে বসতো ছেলে বুড়োর দল। বুড়োগুলো বসে বসে ধুঁকতো, হুঁকোতে টান দিতে গিয়ে কেশে উঠতো খুক্‌খুক্ করে। ছেলেগুলো চ্যাঁচাতো, নয়তো ঝগড়া করতো।

তবু, এ সবের দিকে কারও চোখ পড়তো না, এমন কি অন্য অন্য মেয়েদের দিকেও না। এ গলিতে যে ঢুকতো, এ গলি থেকে যে যখন বেরুতো, চোখ মেলে দেখতো সে শুধু রামীকে। রামী অবশ্য নাম নয়। অন্য কি যেন। তবু ওর টানাটানা চোখ, ডাবের মত কচি আর নিটোল মুখ, আফোটা পদ্মের মত শরীর, আর সত্যিমিথ্যে কিছু একটা পেছনের ইতিহাস—এই সবের জন্যেই ওর নামকরণ হয়েছিল রামী। তা থেকে রামী ধোপানীর গলি।

পাঁচটা বাড়ী পার হয়ে একটা পচা ইটের পাঁজা। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে. কোন কোনটার গায়ে আধ ইঞ্চি পুরু শেওলা। শুধু ইটের রাশ নয়, একটা ডাস্টবিন আবার পাশেই। মরা ইঁদুর, পচা ভাত, মাছের আঁশ, নোংরা কাপড়। যতখানি কদর্য হতে পারে।

এরই পাশে একটা মান্ধাতার আমলের মেসবাড়ী। বাড়ী নয়, অন্ধকূপ। না ঢোকে বাতাস না আলো। তবু তেতলার একটা ছোট্ট ঘরের ভাড়া সাড়ে তিন টাকা। সে কি আজকের কথা। তখন যে কোন গ্র্যাজুয়েট ছেলে চাকরি পেয়েও তিরিশ থেকে তেত্রিশে ওঠবার স্বপ্ন দেখতো।

কালা ঘটক বলতো সে-কথা।—আলো আর বাতাস তো বাপু মিনিমাগনা পাবার হক্ আমাদের, সবাই পায়। আর সাড়ে তিন তিনটে টাকা দিয়েও...

বিদ্রুপের হাসি হাসতো অন্য-অন্য বাসিন্দেরা। বলতো, আপনি যদি এমন শখ করে থাকেন ঘটকমশাই, আলো বাতাস পাবেন কি করে? অত কঞ্জুসের মত না খেয়ে না দেয়ে হরদম টাকা জমাবেন!

কালা ঘটক চটে যেত।—তোমরা তো আমাকে কঞ্জুসই বলবে। বলে দু-বেলা খাবার খরচ জোটাতে পারি না, টাকা জমাবো!

কেউ বিশ্বাস করতো না তবু। বিশ্বাস করবার কথাও নয়। এ তল্লাটে একটা বাড়ীও ছিল কিনা সন্দেহ, যে বাড়ীতে শাঁখ বেজেছে, উলু পড়েছে কাটা ঘটক তার লাল খেরোর খাতা নিয়ে হাজির হবার আগে। হাফ-রাজা থেকে শুরু করে মাতাল বোম্বেটে অবধি যে কোন লোকের বাড়ীতে ছেলেমেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে কি, গিয়ে হাজির হয়েছে ও। কত শত মেয়ের মুখে হাসি ফুটিয়েছে, প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশনে সোনাটা রূপোটা সম্মানী পেয়েছে। দু-একটা পাপ কাজও অবশ্য না করেছে এমন নয়। বকাটে বেকার ছোঁড়াকে সোনার চাঁদ বলে বড়লোকের আদুরে মেয়ের হাতে হাত জুড়ে দিয়ে গোপনে ভাগাভাগি করে নিয়েছে পণের টাকা। মনকে প্রবোধ দিয়ে বলেছে, প্রজাপতির নির্বন্ধ, এ কি আর আমি করলাম! যার যেখানে হবার সব ঠিক হয়ে আছে। বিয়ের মাস কয়েক পরেই হয়তো রঙিন শাড়ী বিলিয়ে দিতে হয়েছে কোন মেয়েকে—কালা ঘটক চোখ মুছে বলেছে, নিয়তি। তবু, বিয়ের পর ছেলেমেয়েদের সুখী দেখতে পেলে খুশী হয়ে উঠেছে ও। অনুভব করেছে এক অপার্থিব আনন্দ।

ওর জীবনের একটা দিক হয়তো বড়ো বেশী অর্থলোলুপ। টাকা ও ভালবাসে, হয়তো কৃপণের মতই ভালবাসে। স্নেহ, প্রীতি, মায়া মমতা সব ধুয়ে মুছে যায়, ন্যায় অন্যায়ের বিচারে ভুল হয় অনেক সময়। কারণ, স্বার্থই ওর কাছে একমাত্র মাপকাঠি, উচিতানুচিতের মানদণ্ড বেঁকে যায় শুধু টাকার লোভে। হয়তো নৃশংস মনে হবে, হয়তো বা অমানুষিক

মনে হবে ওর এই ব্যবহার। তবু, তবু একটা দিক ওর বড়ো বেশী দুর্বল। করুণ কান্নার রেশ সে দিকটায়, ব্যর্থতার ব্যথায় ভরা।

নতুন বিয়ের পর কৌতুক আর কথালাপের অনুরাগ ওর চৌখে পড়েছে হয়তো, নবদম্পতির হাসি আর আনন্দ মন ভরে দিয়েছে। মনে মনে বলেছে, এ তো আমারই হাতে গড়া, এ সুখাবেশ আমিই সৃষ্টি করেছি। তাই পথে যেতে যেতে কোনদিন কোন পরিচিত স্বামীস্ত্রীকে হয়তো দেখতে পেয়েছে দোতলার বারান্দায়, রেলিঙের পাশে, হয়তো ঘনিষ্ঠতার আবেশ দেখেছে তাদের মুখে চোখে, আর সারা পথ তন্ময় বিহ্বলতার সুর বেজেছে ওর মনে।

কিন্তু, তার চেয়েও ওর ভাল লাগে হাস্যমুখর সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান শিশুর মুখ। বিয়ের দু-পাঁচ বছর পরেও নানা অছিলায় গিয়ে হাজির হয়েছে কোন বাড়ীতে, তরুণী মায়ের ঈষৎ শিথিল বুকের কোমলতায় সোহাগে আঁকড়ে ধরা শিশুসন্তানের এতটুকু প্রগলভ হাসি দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। ও নিজেই বুঝি বুঝতে পারে না, কমনীয় মাতৃত্বের ডানায় ঘেরা একটি ছোট্ট শিশুর হাসি দেখবার জন্যে কেন ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ এক অদ্ভুত তৃপ্তি, অবোধ্য এক নেশা। কিন্তু কেন? কেন তা ও নিজেই জানে না। কে জানে, হয়তো আত্মগর্ব। এই সরল আর সহজ মাতৃত্ব, এমন অপরূপ সৃষ্টির মূলে হয়তো নিজেরই বিবাহ-দৌত্যের সফলতা দেখতে পায়। তাই।

শিশু দেখলেই কোলে টেনে নিতে ইচ্ছে হয় ওর। ইচ্ছে হয় আদরে আদরে ডুবিয়ে দিতে।

কিন্তু। ও জানে ওর এই দুর্বল দিকটার জন্যে এতটুকু সহানুভূতি নেই কারো। ওকে অপয়া ভাবে সকলে, ওর বীভৎস চেহারাটাকে ভয় পায়। বিয়ের পর সবাই যেন এড়িয়ে চলতে চায় ওকে। অথচ বিয়ের আগে কন্যাপক্ষ ওকে ভগবানের আশীর্বাদ মনে করে সাদর আহ্বান জানায়।

সে কথা মনে পড়লেও হাসি পায় কালা ঘটকের। লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে চোখের জল মুছে প্রতিজ্ঞা করে, না, আর কোন দিন কোন বাড়ীতে গিয়ে হাজির হবে না। অপরের শিশুকে দেখে কি-এমন আনন্দ, কিসের তৃপ্তি!

তবু খবর পেয়ে চুপ করে থাকতে পারে না। চঞ্চল হয়ে ওঠে ছুটে যাবার জন্যে। ঘুমোতে পারে না সারা রাত।

পর পর তিন দিন নিজেকে বেঁধে রাখলে ও। কে যেন খবর দিয়েছিল, হারাণ চাটুজ্যের মেয়ে বুলু এসেছে। একটি সুন্দর ছেলে কোলে নিয়ে ফিরে এসেছে। আসুক, ওদের সঙ্গে সব সম্পর্ক তো বিয়ের পরই শেষ হয়ে গেছে। প্রাপ্য পারিশ্রমিকও পেয়ে গেছে। কেন যাবে ও আবার? না প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা টিকলো না। মনকে প্রবোধ দিলে, আমার আবার লজ্জা অপমান! আর তা ছাড়া কে বলতে পারে, রক্ষিতদের মেয়ের মত বুলুও হয়তো খুশী হয়ে হাতের চুড়িই একগাছা দিয়ে দেবে।

এমনি সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়লো কালা ঘটক। হাতে লম্বা আর মোটা খেরোর খাতাটা নিতে ভুললো না। পুরোনো ছেঁড়া ছাতাটা বগলদাবায়।

—কৈ মা বুলু, ছেলে দেখতে এলাম তোমার। বুলু মা!

চটি চট-চট করতে করতে একেবারে দোতলায় উঠে হাঁক দিলো।

ছোট্ট সরল মুখের মেয়ে বুলু, বয়েসে হয়তো ষোলও শেষ হয় নি। তেমনি বোকা বোকা চোখ মেলে একটা ডাঁসা পেয়ারা কামড়াতে কামড়াতে বেরিয়ে এলো বুলু। পরমুহূর্তেই হেসে মাথায় ঘোমটা তুলে দিলে একটু।

—ও মা, আপনি? আসুন।

পান খাওয়া কালো কালো দাঁত বের করে সশব্দে হেসে উঠলো কালা ঘটক। বলল, কই ছেলে কই? শুনেই ছুটে এলাম, আমার বুলু মা-র ছেলে দেখতে আসবো না?

—বসুন, আনছি। একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো বুলু। পরক্ষণে বললে, দেখি আবার সে দস্যি ছেলে কোথায় গেল। হামা দিতে শেখার পর থেকে কি আর রক্ষে আছে। কখন কোথায় গিয়ে ঘুপটি মেরে বসে থাকে, সারা বাড়ী খুঁজে পাত্তা পাওয়া যায় না।

—যেখানেই থাক্ খুঁজে নিয়ে এসো। তোমার ছেলে না দেখে নড়ছি না আমি।

—না, না। বসুন এক্ষুণি আনছি। ব'লে বেরিয়ে গেল বুলু।

মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এলো, কোলে একটি হাসি হাসি মুখ সুদর্শন শিশুকে নিয়ে। বললে, কি দুষ্টু ছেলে বাবা, সিঁড়ির তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে ঝিয়ের সঙ্গে মুড়ি খাচ্ছিল।

কালা ঘটক হাসলো ওর কথায়। ভালও লাগলো।

বললে, বাঃ, বেশ সুন্দর হয়েছে। একেবারে বাপের মত গোলগাল মুখ, আর মায়ের মত রাঙা টুকটুকে গায়ের রঙ। বেশ নাদুসনুদুসটি হয়েছে কিন্তু।

—না, ক-মাস হল একটু রোগা হয়ে গেছে। বুলু প্রতিবাদ করলে।

কালা ঘটক নিজের ভুল বুঝতে পারলো। ছোট ছেলে মোটাসোটা হলেও নাকি তা বলা উচিত নয়। চোখ লাগে। রোগা হয়ে যায়।

তাই শুধরে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, একটু রোগা রোগা মনে হচ্ছে বটে। তবে খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে বুলু মা। আর হবে না-ই বা কেন, এ তো এলোমেলো বিয়ে নয়, রীতিমত রাজযোটক করে বিয়ে দিয়েছিল এই শর্মা। হুঁ-হুঁ।

বুলু লজ্জার-হাসি হাসলো। আরো চেপে ধরলো ছেলেকে বুকের কাছে।

কালা ঘটক হাত বাড়ালে হঠাৎ—এসো খোকা, আমার কোলে এসো। এসো, আমার কাছে এসো, রাঙা টুকটুকে বৌ এনে দেবো, ঠিক তোমার মতন। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো ও, চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়িয়ে কাছে এগিয়ে গেল।

শিশু এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল কালা ঘটকের দিকে। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে। ও কাছে এগিয়ে যেতেই ভয়ে আশঙ্কায় সশব্দে কেঁদে উঠলো! কাঁদতে কাঁদতে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

ছেলেকে সরিয়ে নিয়ে গেল বুলু। ওকে রেখে এসে দেখলে ধুতির খুঁটে চোখ মুছছে কালা ঘটক। কি হলো। কে জানে, এমনিই হয়তো।

বললে, দিদিমার কোলে গিয়ে তবে ঠাণ্ডা হলেন ছেলে, কি পাজি যে হয়েছে।

হেসে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলে কালা ঘটক। বললে, ভয় পেয়েছে।

ভয় সত্যিই পেয়েছিল। সকলেই ভয় পায়। এমন বীভৎস আর কুৎসিত চেহারা দেখে বড়োরাই ভয় পায়। এতটুকু কোলের ছেলে কেঁদে উঠবে না? গায়ের রঙ শুধু কালো নয়, চকচকে। আর বিচ্ছিরি লম্বা, রোগা। বাজপড়া গাছের মত পুড়ে ঝলসে গেছে যেন সারা শরীর। চোখের নীচে দুটো হাড় উঁচু হয়ে আছে চোয়ালের চেয়েও। বসন্তের দাগে সমস্ত মুখখানা ভরে গেছে, এমবস্ করা কালো রেক্সিনের মুখোস

পরে আছে যেন। আর তার মাঝে দুটো ধবকধবকে বড়ো বড়ো চোখ—ঘোলাটে লাল চোখ। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত মনে হয়। এমন বীভৎস চেহারার একটা লোক কাছে এগিয়ে এলে কেঁদে ককিয়ে উঠবে না ছোট ছেলেরা? কালা ঘটক নিজেও তা জানে। তাই, প্রতিজ্ঞা করেছিল ও, যাবে না কারো ছেলে দেখতে, কোলে নেবার জন্যে হাত বাড়াবে না আর। তবু, ঠিক সময়টিতেই ভুলে যায় ও।

বুলুও লজ্জিত হয়েছিল! হাজার হোক্, স্বামীপুত্রে সুখী হয়েছে ও। তাই কালা ঘটকের ওপর হয়তো কিছুটা সহানুভূতি ছিল।

সান্ত্বনার সুরে তাই বললে, যা ছিঁচকাঁদুনে ছেলে, কারো কোলে যেতে চায় না।

কালা ঘটকের কালো মুখখানা আরো কালো হলো। বললে. না মা, দোষ তোমার ছেলের নয়, দোষ আমার। ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখলেই ভয় পায়। তবু কি যে হয়, কিছুতেই স্বভাবটা শুধরোতে পারি না, মনে থাকে না কিছুতেই।

—না, না, সেকি! দূর, তা না, দাঁড়ান নিয়ে আসছি ওকে, ভয় পাবে কেন।

ছুটে চলে গেল বুলু।

কালা ঘটক শুনতে পেল বুলু বলছে, দাও মা, ওকে নিয়ে যাই, দেখিয়ে আনি।

উত্তর এলো—না না, ঐ ভালুকটার কাছে ওকে নিয়ে যেতে হবে না। ছেলে যা ভয় পেয়েছে, শেষে অসুখবিসুখ একটা হোক আর কি। যা, যা, ওকে যেতে বলে দে, অত আদিখ্যেতা দেখাতে হব না।

একটা গল্প তৈরি করে বুলু ফিরে এলো। কিন্তু কালা ঘটককে

শুনলো ও। মনে মনে হাসলো।

আর দেখতে পেল না। আহত, লজ্জিত বোধ করলো বুলু। ছুটে গেল রেলিঙের ধারে, অনুসন্ধানী চোখে তাকালে পথের দিকে। দেখতে পেল দ্রুত পায়ে গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কালা ঘটক। চোখের জল মুছতে মুছতে ছুটে গিয়ে মা-র কোল থেকে কেড়ে নিলো ছেলেকে, রাগে আর ক্ষোভে তার পিঠে একটা চড় বসিয় দিলো সজোরে।

ও যে কতখানি কুৎসিত, কতটা কদর্য ওর চেহারা, তখন অবধি জানতো না ও। কালা ঘটক নাম হয় নি তখনও। যেদিন জানলো সেদিনই বুঝলো যে পিতৃদত্ত নামটাও ওকে ব্যঙ্গ করে।

শ্যামসুন্দর।

কুড়ি বছর বয়েসের বুদ্ধিতে শ্যামসুন্দর এটকু বুঝেছিল যে ওর চেহারার সঙ্গে এ নামটা একেবারেই খাপ খায় না। কুড়ি বছর বয়েসের শ্যামসুন্দর! সে সব দিনের কথা আজ আর মনে পড়ে না ওর। অনেক কাল ভুলে গেছে, ভুলে যেতেই চেয়েছে।

কল্‌মিপুর গ্রামের ইস্কুলে তিন তিন বছর ধরে একই ক্লাসে পড়ে থাকতে দেখে হরিধন ঘটক ঠিক করলেন ছেলের বিয়ে দিতে হবে। সংসারী হয়ে সময় থাকতে থাকতে যদি বাপের বিদ্যেটা শিখে নিতে পারে তো কোন রকমে ভাত কাপড়টা জুটে যাবে।

বিঘে দশ বারো জমি, আর একটা ছোট্ট কুঁড়ে। চাষবাস দেখে কিছুটা সুরাহা হবে, বাকিটা পুষিয়ে নিতে পারবে ঘটকালির ব্যবসায়। তাই ছেলের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন তিনি গ্রামেরই বৃন্দাবন বাঁড়ুজ্যের মেয়ে উমার সঙ্গে। ন বছরের মেয়ে, মোটামুটি নাক মুখ চোখে শ্রী আছে। অন্তত কুৎসিত নয়। গায়ের রঙটা একটু কালো, সেদিক থেকে অবশ্য আপত্তি ছিল না, ছেলেও তাঁর কন্দর্প নয়।

কিন্তু, পাঁজিপুঁথি দেখে বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করে হরিধনও উঠলেন আর উমাও গিয়ে ঘরে খিল আঁটলো। বাপ-মায়ের সাধাসাধি অনুনয়বিনয় ভয় দেখানো সব বিফল হলো। সেই যে বিছানায় পড়ে কাঁদতে শুরু করলে উমা, সন্ধ্যে অবধি আর উঠলো না।

উমার মা শেষকালে আদরে আব্দারে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছে বল্। কাঁদছিস্ কেন?

ন বছরের উমা মায়ের বুকে লুটিয়ে পড়লো আবার। কাঁদো কাঁদো রাগত স্বরে বললে, ও যমদূতকে আমি বিয়ে করবো না।

শ্যামসুন্দর শুনলো। গ্রামসুদ্ধ সকলে শোনালো ওকে, হাসতে হাসতে বললে, হায় রে শ্যাম, কালপেঁচির মত মেয়ে উমা, সেও বলে যমদূতকে আমি বিয়ে করবো না।

চেনা অচেনা কেউ ব্যঙ্গ করতে ছাড়লো না। লজ্জায় অপমানে বাড়ীর লোকের সঙ্গেও কথা বন্ধ করলো শ্যামসুন্দর। মুখ তুলে তাকাতেও কষ্ট হ'ত ওর। রাত্রে ঘুম আসতো না। সারা রাত এপাশ ওপাশ করতো। লুকিয়ে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতো, আর ইচ্ছে হ'ত চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলতে।

শ্যামসুন্দরের মা বুঝতেন। হঠাৎ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল একদিন, শুনতে পেলেন শ্যামসুন্দর ছট্‌ফট্‌ করছে বিছানায়। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ডেকে তুললেন ছেলেকে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, কি হয়েছে তোর? ন বছরের একফোঁটা একটা মেয়ে কি বললে, তাতে কাঁদতে আছে, ছিঃ। সবাই কি সুন্দর হয় নাকি, সুন্দর তো লাখে একটা মেলে। অনেক ভাল মেয়ে নিয়ে আসব আমি আমার ঘরে।

মা-র সহানুভূতির স্পর্শে সত্যিই কেঁদে ফেললো শ্যামসুন্দর।

কিন্তু হরিধন ঘটক নিজের ছেলের জন্যে পাত্রী যোগাড় করতে পারল না। পাঁচ পাঁচবার সব ঠিকঠাক হয়ে ছেলে দেখতে এসে বিয়ে ভেঙে যায়। শ্যামসুন্দরের মা বললেন, ভাল ঘর অনেক দেখা হয়েছে, ভাল মেয়ে দেখ। সব চাষা, চামার সব। আমার ঘর চাই না, ভাল মেয়ে চাই।

প্রথম আঘাতটা সয়ে গিয়েছিল শ্যামসুন্দরের, ভুলেও যেত হয়তো। কিন্তু তারপরেই এলো আরেকটা আঘাত।

ছাব্বিশ বছর বয়সে বিয়ে হলো শ্যামসুন্দরের। কল্‌মিপুর থেকে মাইল আঠার দূরের এক গ্রামে। সত্যিকারের সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে। রূপে যৌবনে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের মত মেয়ে। হয়তো বংশে কোন কলঙ্ক ছিল, হয়তো বা তার বিধবা মায়ের সতীত্বে সন্দেহ ছিল, তাই বিয়ে হচ্ছিল না মেয়েটির। তারই সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল শ্যামসুন্দরের, বাসর কেটে গেল। তবু শুভদৃষ্টির পর আর একটিবারের জন্যেও তার মুখ দেখতে পেল না ও, পেল না একটা কথারও উত্তর। প্রথম ওকে দেখলো, ওর মুখ দেখতে পেল বাসররাত্রির শেষে আলো-আঁধারির ভোরে। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে কাঞ্চনা। সুন্দর মুখখানা নীল হয়ে গেছে, ফেনা জমে আছে ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে।

লোকে কাঞ্চনার চরিত্রে দোষারোপ করলো। বুড়োরা বললে, প্রণয় যদি ছিলই কারু সঙ্গে তো বিয়ের আগে বললেই পারতো। বুড়িরা বললে, যেমন মা তার তেমনি মেয়ে হবে তো!

কিন্তু শ্যামসুন্দর কিছু বললো না। ও জানে, দোষ কাঞ্চনার নয়। শুভদৃষ্টির সময় চোখ তুলেই কাঞ্চনা শিউরে উঠেছিল কেন, তা জানে ও। কাঞ্চনার সমস্ত মুখে কিসের ছায়া পড়েছিল তা শ্যামসুন্দর দেখেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাঞ্চনার সে মুখে হতাশা, আতঙ্ক, ঘৃণার ছায়া কেঁপে উঠেছিল।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের পিছনে পিছনে শ্যামসুন্দরের চোখ ঠেলে জল গড়িয়ে পড়তে চাইলো। মাথার ভেতর অসহ্য এক ঝিমঝিমানি, ভারী ভারী ঠেকে সমস্ত মাথাটা। অথচ বুকের ভেতরটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে, অসহ্য এক শূন্যতায় বুক ভেঙে পড়তে চায়। শরীরের সবটুকু শক্তি যেন হারিয়ে গেছে, এতটুকু রক্ত নেই, তেজ নেই।

কাঞ্চনার মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল কাঞ্চনার মা। আর সেই কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা কথা কানে এসেছিল ওর। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয়েছিল, ওর নিজের মুখখানা যেন হঠাৎ চুপ্‌সে এতটুকু হয়ে গেছে। ঘর থেকে ছুটে পালিয়েছিল শ্যামসুন্দর। চোরের মত, খুনী আসামীর মত ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে কাটিয়েছে সারাটা দিন। যত দূরেই হোক, মানুষ দেখলেই ভয় পেয়েছে, পায়ের শব্দে গলার স্বরে চমকে উঠেছে। সমস্ত দিন, অর্ধেক রাত্রি ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে মাঠের পর মাঠ পার হয়েছে হেঁটে, আঠার মাইল দূরের গ্রাম কল্‌মিপুর, কল্‌মিপুরে এসে পেঁাচেছে। তবু বাড়ী ঢুকতে পারে নি। একদিকে লজ্জা আর আত্মগ্লানি, অন্যদিকে প্রচণ্ড ক্ষিদে আর ক্লান্তি। কিন্তু নিজের বাড়ীতে ঢুকতেও সাহস হয় নি ওর। সারা রাত বাড়ীর চারপাশে ঘুরঘুর করেছে, ছোট্ট এতটুকু একটা মেঠো তিতিরের ডাকে চমকে উঠেছে।

তারপর একসময় ক্ষিদেয় অবসন্ন হয়ে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল!

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেল ওর। দু কাঁধের ওপর দুটো কোমল স্নেহের স্পর্শে। ওকে ডেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন ওর মা। ঘুম ছুটে গিয়েছিল ওর চোখ থেকে, তবু চোখ বুঁজে রইলো। চোখ তুলে তাকাতে পারলো না। শুধু অনুভবে বুঝলো, সস্নেহে, সমবেদনার অশ্রু লুকিয়ে মা পাখার বাতাস করছেন এক হাতে, আর অন্য হাতের নরম আর জ্বালাহর আঙুলগুলো কাঁকুইয়ের মত ওর রুক্ষ চুলে বিলি দিচ্ছে।

চুপ করে পড়ে রইলো ও, শান্তিতে সান্ত্বনায়। টপ্‌ করে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পড়লো ওর কপালে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ চেয়ে তাকালো ও স্নেহ প্রীতি ভালবাসায় ভরা মুখখানির দিকে। মাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলে, কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ও।

শ্যামসুন্দরের বাবা ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছিলেন, সব কিছু শুনেছিলেন. শ্যামসুন্দরের মা।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন শুধু, তোর আর দোষ কি বাবা। গরীবের ঘরে জন্মেছিস. দুঃখ তো পেতেই হবে।

দিন কয়েক পরে ঐ একই কথা শুনতে পেল ও। পাশের ঘরে বাবা বলছেন, কপাল গো সবই কপাল। তা না হলে আমার মত গরীবের ঘরে জন্ম হবে কেন।

মা বুঝি উত্তর দিলেন, বাপের টাকার জোরে কত কালপেঁচির বিয়ে ঘটিয়েছ তুমিই কত সোনার চাঁদ ছেলের সঙ্গে. তা কি আর দেখি নি!

শ্যামসুন্দরের বাবাও হয়তো এই আঘাতেই মৃত্যুর দিনটা কাছে টেনে আনলেন। শ্যামসুন্দরের মা তারপরেও দু-বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু ছেলের বিয়ের কথা কোনদিন ভুলেও মনে আনেন নি।

শ্যামসুন্দর মুক্তি পেল। জমিজমা, বাড়ীঘর বিক্রি করে দিয়ে শুধু বাপের লাল খেরো-বাঁধানো খাতাটি নিয়ে চলে এলো কোলকাতায়। রামী ধোপানীর গলির এই মেস বাড়ীতে।

সকাল সন্ধ্যে ঘুরে বেড়াত এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী। বগলে ছাতা, হাতে পৌনে একগজ লম্বা লাল খাতা, আর পায়ে চটি। এই নিয়ে সারা শহর টহল দিয়ে বেড়াত হেঁটে হেঁটে। হয়তো অত্যধিক লম্বা আর রোগা চেহারার জন্যে, হয়তো বা সম্ভবের অতিরিক্ত হাঁটার ফলেই একটু কুঁজো হয়ে পড়লো ও। এমন এক বিচিত্র চেহারা হলো যা দুশো গজ দূর থেকে দেখেও চেনা যায়। খ্যাতি আর প্রতিপত্তি দু-ই জুটলো. সঙ্গে সঙ্গে একটা উপাধিও। কালা ঘটক। শ্যামসুন্দর নামটাও অনেকে ভুলে গেল।

কিন্তু প্রতিপত্তি যা বাড়ল তা শুধু পোস্ট আপিসের খাতায়, সেভিংসের পাস-বইয়ে। ঐ পচা নোংরা মেস বাড়ীটা ও বদলালো না। পোশাক পরিচ্ছদেও এলো না কোন পারিপাট্য। ও-সবে বুকের গভীরে ক্ষতচিহ্নটা হয়তো লুকোনো যায় অপরের চোখের আড়ালে, কিন্তু নিজের কাছ থেকে নিজেকে লুকোবে কি করে! কালো কারে বাঁধা চ্যাপ্টা দোয়াত আর শরের কলমটাকে শুধু বিদায় দিলো ও। একটা কমদামী ভাঙা ফাউণ্টেন-পেন, মাথার হারানো ক্যাপটার বদলে মোটা কঞ্চি ফোঁপড়া করে নিয়ে কাজে লাগানো। এ ছাড়া আর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। না চেহারায়, না ব্যবহারে।

এই পচা নোংরা গলির ভাঙা মেসে থাকার অবশ্য একমাত্র কারণ ওর কার্পণ্য নয়। আর আর বাসিন্দেরা হয়তো তাই ভাবতো! আসলে যেতে আসতে গলির মুখে চোখ পড়তো রামীর ওপর। বছর পনর বয়সের ধোপাদের মেয়ে রামী গোলগাল টুলটুলে মুখ, মিষ্টি দু-খানি ডাগর চোখ মেলে তাকাতো রামী। আর সেটুকু দেখবার লোভেই মেস বদল করতো না শ্যামসুন্দর। কিন্তু এই টুকরো ভাল লাগাও ওর কপালে ছিল না বোধ হয়। প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যায় একবার করে রামীকে দেখতে পাওয়ার, দেখা পাওয়ার অধিকার ছিল এ গলির সবারই, সব বাসিন্দেরই!

সমস্ত দিনের মধ্যে একটি মাত্র রোম শিহরণ। শুধু দৃষ্টির রোমাঞ্চ।

তবু। তবু মাঝে মাঝে অব্যক্ত এক ব্যথার দীর্ঘশ্বাস ফেলতো ও। হাহাকার ঠেলে উঠতো বুক থেকে। একটি নারীর সঙ্গ-কামনার স্বপ্ন আঁকতো সারা রাত। একটি নিটোল মুখ, একটি কমনীয় কোমল শরীরের স্পর্শ পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠতো ও কখনো-সখনো।

কাজের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজতো শ্যামসুন্দর। তৃপ্তির আবেশে কাজ ভুলে যেত।

লম্বা খেরোর খাতায় হাজারো পরিবারের খুঁটিনাটি লিখে রাখতো, কত কত ছেলে আর মেয়েদের নানান বৃত্তান্ত। আর, আর বিবাহযোগ্যা কন্যাদের নাম ধাম ঠিকুজির পাশে পাশে এঁটে রাখতো তাদের ফটো।

কোন কোন রাতে মোমবাতি জেবলে খাতা লিখতে লিখতে হঠাৎ কখনো হয়তো থেমে যেত শ্যামসুন্দর। কোন একটি ফটোর দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্ণিমেষে তাকিয়ে থাকতো! আবার হয়তো পাতা উল্টে প্রত্যেকটি ফটো খুঁটিয়ে দেখতো লোভাতুর চোখে, অদ্ভুত এক রস-রোমন্থনের আনন্দে।

শুধু কি ছবি! রক্তমাংসের শরীরের ছোঁয়া নিতেও কসুর করতো না, তৃপ্তির স্পর্শ নিতো নানা অছিলায়।

ঘনঘন যাতায়াতে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে হয়তো কোন পরিবারের সঙ্গে। সপ্তদশী কি অষ্টাদশী যুবতী কন্যার সঙ্গে রসিকতা করে জিগ্যেস করেছে, কি চাস রে খুকি, ঘর চাস না বর চাস?

খুকি হয়তো লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেছে, কিংবা তেমন তুখোর মেয়ে হ'লে বলে উঠেছে, দুই-ই চাই। আর অমনি তার হাতে চিমটি কেটে বা চিবুকে হাত দিয়ে ও বলে উঠেছে, ভারি তো রূপ—

দুই-ই চাই। নির্জনে পেলে দু-একটা আধা-অশ্লীল প্রশ্নও করতে ছাড়ে নি শ্যামসুন্দর। জিগ্যেস করেছে, বরের চেহারা কেমন হবে শুনি? ইয়া ষণ্ডাগুণ্ডা ষাঁড়ের মত, না কচি বকনা বাছুরের মত?

আর এ প্রশ্নেও যদি উত্তর এসেছে, 'রাজপুত্তুরের মত', তো চট করে হাত বাড়িয়ে তার নরম হাতখানা ধরে ফেলেছে শ্যামসুন্দর, টিপে টিপে দেখেছে কনুই অবধি নরম আর সুগোল মসৃণ হাতখানা, বলেছে, ইঃ এমনি শক্ত খটখটে হাত, রাজপুত্তুর বিয়ে করবে! পছন্দ করবে কেন শুনি? তারা নরম তুলতুলে শরীর না হলে বিয়ে করতে রাজীই হবে না।

অপর কারো হাতটা কাছে টেনে নিয়ে চিমটি কেটে বলেছে, দেখি লাল টুকটুকে হয় কিনা, রঙটা যে নকল নয় তা জানতে হবে তো আগে।

মেয়েরা হেসেছে, কৌতুকে গড়িয়ে পড়েছে। কেউ বা হয়তো লজ্জায় অধোবদন রয়ে গেছে। তবু এইটুকু স্পর্শসুখ, এই ক্ষণরোমান্সের মধ্যে আনন্দ পেয়েছে শ্যামসুন্দর।—এতটুকু রোমাশিহরণেই সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু এই রসিকতা আর কৌতুকের ফাঁকে কেউ হয়তো প্রশ্ন করেছে, আচ্ছা, ঘটকমশাই, আপনি বিয়ে করেন নি কেন?

হেসে হাল্কা হয়েছে শ্যামসুন্দর।—করি নি, কি হবে বিয়ে ক'রে।

কেউ ব্যঙ্গের স্বরে বলেছে, উঁহু। নিশ্চয় আপনার যোগ্য রূপসী মেয়ে পান নি তাই।

শ্যামসুন্দর হেসে উঠেছে হো হো করে।

হয়তো শ্যামসুন্দরেরই কোন অশিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে, অন্য কেউ হাসি চাপতে চাপতে প্রশ্ন করেছে,—আচ্ছা ঘটকমশাই, আপনি কখনো প্রেমে পড়েছিলেন বুঝি?

আরেকজন জুড়ে দিয়েছে, জানিস না বুঝি? ঘটকমশাই মেয়েটার প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় মেয়েটা আত্মহত্যা করে, তাই তার দুঃখুতে ঘটকমশাই আর পাণিগ্রহণ করেন নি কারো।

মেয়েরা হেসেছে, হেসে লুটোপাটি খেয়েছে, আর শ্যামসুন্দর যোগ দিয়েছে সে হাসিতে। কিন্তু কেউ লক্ষ্য করে দেখে নি, শ্যামসুন্দরের সশব্দ হাসির পিছনে কতখানি ব্যথার বাষ্প লুকিয়ে আছে।

হ্যাঁ। ব্যথা আর বেদনার অশ্রু টলমল করে ওর ঘোলাটে রক্তচক্ষুর কোণে। ওর ফাঁকা আর ফাঁপা বুকে শুধু দীর্ঘশ্বাস থমকে আছে।

তবু। তবু একটা দিনের জন্যে, একটি মুহূর্তের জন্যেও তো একবার রোমে রোমাঞ্চ জেগেছিল ওর!

সেদিনের কথা মনে পড়লে অসহ্য একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে ওর বুকে। সারা রাত বিছানায় ছটফট করে কাটাতে হয়। ঘুম নামে না শ্যামসুন্দরের চোখে। শুধু স্বপ্ন দেখে, কল্পনার ডানা মেলে উড়ে যেতে ইচ্ছে হয়।

শুধু একটি দিন। ক্লান্তিময় দিনের গায়ে একটি মাত্র স্নিগ্ধ সকাল যেন। রাঙতায় মোড়া রাতের মত উজ্জ্বল আর রোমাঞ্চমধুর। অতি-রোমন্থনে তাও যেন মিলিয়ে গেছে স্বপ্ন হয়ে। শুধু একটা ভুলে যাওয়া গানের রেশ বেজে ওঠে ওর কানের পাশে, থেমে যাওয়া নৃত্যনূপুর বুঝি বা বুলি বুলোয় থেকে থেকে।

তখন সবে এ শহরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে শ্যামসুন্দরের। গলি-ঘুঁজি হালচাল তখনও ঠিক মত জানা হয় নি। লাল শালুতে বাঁধানো লম্বা খাতাখানার মাত্র কয়েকটা পাতায় কালির আঁচড় পড়েছে।

মালার মত সরু মরাগাঙের বুকে ছোট্ট একটা সাঁকোর মত ব্রিজ, পার হবার আগেই ডান দিকে একটা গলি। প্রস্থে স্বল্প হলেও দৈর্ঘ্যে সীমানা নেই। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে। গঙ্গার ধারে ধারে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা। ছোট আঁকাবাঁকা রাস্তা, জলে কাদায় নোংরা হয়ে থাকে সর্বক্ষণ, পীচের আবরণ আছে কি নেই বোঝা-ই যায় না। মাঝে মাঝে খোলা হাইড্রেন্ট থেকে ফুটন্ত কেৎলির মত জল উথলে পড়ছে অনর্গল, দু-চারটে কাদামাখা মোষ আর ঠেলাগাড়ি বেওয়ারিশের মত পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে। গঙ্গার ধারে ইঁটের পাঁজা চুন সুরকির দোকান। বাঁশ কাঠ আর করগেটের গুদাম। রাস্তার এ-পারেও কয়েকটা টিনের শেড, তারপর বাখারি দিয়ে ঘেরা একটা বস্তি—ছিটেবেড়ার দেয়াল, লম্বা গেলাসের মত মেঠো টালির ছাদ।

বগলে ছাতা আর হাতে খাতা নিয়ে হনহন করে হেঁটে চলেছিল শ্যামসুন্দর। হঠাৎ, কোথাও কিছু নেই, নামলো তুমুল বৃষ্টি। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। শেষ ভাদ্রেই কাঁচা সোনার রোদ মুছে গেল হঠাৎ, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণার তোড়ে শুরু হলো ধারাবর্ষণ। আর ঝড়। একদিকে প্রবল বৃষ্টি, অন্যদিকে ঝড়ের দাপট। তার ওপর বিদ্যুতের চমক আর মেঘের নিনাদ। ছাতাটা খুলে কয়েক পা এগিয়েছে শ্যামসুন্দর, অমনি দমকা বাতাসে ছাতাটা হলো হাতছাড়া। রাস্তার পাশেরই একটা

খোলা দরজার দিকে ছুটে গেল শ্যামসুন্দর। সঙ্গে সঙ্গে কাদায় পিছলে গিয়ে পড়লো একেবারে মেয়েটির গায়ে ওপর। তার আগে হয়তো লক্ষ্যও করে নি শ্যামসুন্দর, নরম গলার ধমক শুনে চোখ তুলে তাকালো। সুসজ্জিতা একটি মহিলার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ও, এ কথা বুঝতে পেরে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল শ্যাম-সুন্দর। কিন্তু তার আগেই চীৎকার শুরু হয়ে গেছে। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করলে শ্যামসুন্দর। কিন্তু প্রৌঢ়াটির চীৎকার যেন আরও বেড়ে গেল। লোক জমা হয়ে গেল ক্রমশ। তারপর, তারপর আর বিশেষ কিছু মনে পড়ে না শ্যামসুন্দরের। শুধু প্রচণ্ড প্রহারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কাতর অনুনয় বিনয় করেছিল ও, হাতে পায়ে ধরেছিল প্রত্যেকের। কিন্তু এতটুকু দয়াও কেউ দেখায় নি। কপালের রক্ত লেগেছিল ওর হাতে, আর সেই রক্ত দেখেই সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল ও।

জ্ঞান হওয়ার পর চোখ মেলে তাকিয়েই দুটি ব্যথা কাতর সজল চোখ দেখতে পেল শ্যামসুন্দর। সমস্ত শরীরে ওর অসহ্য যন্ত্রণা, মাথাটা ভার ভার। কপালে হাত দিয়ে দেখলে কাটা জায়গাটা কাপড় দিয়ে বাঁধা। বিস্ময়ে চোখ মেলে তাকালো শ্যামসুন্দর।

একটি সুন্দর মুখ। চিকণ কালো মুখ, নিটোল গালে লাবণ্যের আভা। আর এই নিকষ কৃষ্ণছায়ার মাঝে দুটি গভীর কালো চোখের মাধুরী। বেদনার্ত, স্নেহস্নিগ্ধ। আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখলে শ্যামসুন্দর, অনুভবের দৃষ্টিতে তাকালো। সাদা ধবধবে একটা শাড়ী পরেছে মেয়েটি, কালো দেহের কালিমা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আরো। তবু, কি প্রশান্তি, কতখানি মুগ্ধমমতার আবেশ ঐ চোখে।

মাথার কাছে বসে পাখা নেড়ে বাতাস করছিল মেয়েটি।

শ্যামসুন্দর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করলে, তুমি—তুমি কে?

স্নিগ্ধ বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে উত্তর দিলো মেয়েটি, অত্যন্ত সহজ স্বরে।—আমি রাঙি। মাথায় ব্যথা লেগেছে আপনার? যন্ত্রণা হচ্ছে?

অভিভূত ভাবে শ্যামসুন্দর বললে, না তো!

আবার সেই সুমিষ্ট হাসি হাসলে মেয়েটি। শ্যামসুন্দরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বাঁ হাতের আঙুলগুলো ওর চুলের ভেতর নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, চোখ বুঁজুন, চোখ বুঁজে ঘুমোবার

চেষ্টা করুন। কিছু হয় নি, এখনি সেরে যাবে।

সত্যিই চোখ বুজলো শ্যামসুন্দর। রাঙির প্রত্যেকটি কথা যেন আদেশ মনে হলো ওর কাছে। চোখ বুজে পড়ে রইলো ও, জীবনে এতখানি আরাম বুঝি কখনও পায় নি।

এক সময় শ্যামসুন্দর অনুভবে বুঝলে, রাঙি উঠে গেল।

ক্ষণপরেই ফিরে এল আবার। পায়ের শব্দে টের পেল শ্যামসুন্দর। তবু চোখ খুললে না।

—নিন, এই দুধটুকু খেয়ে নিন।

কাঁধের ওপর একটা নরম হাতের স্পর্শও পেল।

চোখ চেয়ে রাঙির হাত থেকে বাটিটা নিয়ে এক চুমুকে দুধটা খেয়ে ফেললে ও। তারপর বালিশে ভর দিয়ে একটু উঠে বসে তাকালে রাঙির দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল শ্যামসুন্দর।

শাড়ী নয়। শাড়ী বলে ভুল হয়েছিল ওর। কালো পাথর কুঁদে তৈরী একটি ছোটখাটো অপূর্ব দেহ, চোখে মুখে পনেরো বছরের মেয়ের সরলতা। অমন কমনীয় রূপ, শরীরের এমন কোমলতা এর আগে বুঝি বা চোখে পড়ে নি শ্যামসুন্দরের। অনেক বনেদী ঘরের রূপসী কন্যার যৌবন চোখে পড়েছে শ্যামসুন্দরের, দেখেছে অভিজাত তরুণীর রেশমাবৃত দেহের প্রসাধন। চোখ ঝলসে দেবার মত সৌন্দর্য দেখেছে ও, দেখেছে নববধূর চন্দন-চিত্রলেখার মাধুর্য। কিন্তু এমন নিবিড় স্নিগ্ধতা দেখে নি।

তবু।

তবু, ওর দেহ ঘিরে সাদা ফুটফুটে থান কাপড়খানা যেন এ রূপকে ব্যঙ্গ করছে। ওর এই বৈধব্যের শুচিতা যেন সমস্ত রূপ হরণ করে নেবার জন্যে ব্যগ্র। তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো শ্যামসুন্দর।

—এখন আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না, না? মৃদু হেসে রাঙি প্রশ্ন করলে।

—না। শ্যামসুন্দর মাথা নাড়লে।

—তা হলে কাপড়টা বদলে ফেলুন। ভিজে চপচপ করছে, তাছাড়া রক্ত কাদা লেগে একেবারে বিচ্ছিরি হয়ে গেছে।

একখানা ধুতি রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেল রাঙি। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো একটা গেঞ্জি হাতে নিয়ে।

জামাটাও বদলে ফেললে শ্যামসুন্দর। ভিজে ময়লা জামা আর কাপড়খানা তুলে নিয়ে রাঙি বললে, ওরা কি মানুষ, না কি বলুন তো? শুধু শুধু আপনাকে... ..

বিষণ্ণ হাসি হাসলে শ্যামসুন্দর।—তুমি না থাকলে......

কি যেন বলতে গেল শ্যামসুন্দর, তার আগেই রাঙি বলে উঠলো, ও কি, উঠলেন কেন?

শ্যামসুন্দর বললে, অনেক তো করেছো, আর কষ্ট দেব না। যাই......

—কষ্ট? জলে ভিজে গেল ওর চোখের কোণ দুটো।—একটা মানুষকে মিছিমিছি একদল গুণ্ডা এসে মারবে আর—কথা শেষ করতে পারলো না ও, গলার স্বর আটকে গেল, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা অশ্রু। কাপড়ে চোখ মুছে বললে, না, না, এত রাতে যাওয়া হবে না, কাল যাবেন।

রাঙির চোখে জল দেখে শ্যামসুন্দরের চোখেও জল এলো। অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে বললে, রাত হয়ে গেছে নাকি? আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলে, দিনের আলো নেই, লণ্ঠনের আলো কাঁপছে ঘরের কোণে। আর জানালার ওদিকে ঘন অন্ধকার, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দ। বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

রাঙি ঠোঁট টিপে হাসলে। চোখ তখনও ছলছল করছে ওর। চোখের জল চাপা দেবার জন্যেই হয়তো হঠাৎ খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠলো ও।

—কি, হাসছো যে?

কাপড়ের এক প্রান্তে মুখ লুকিয়ে কৌতুকের চোখে রাঙি প্রশ্ন করলে, বৌ ভাবচে বুঝি? তাই ছটফট করছেন বাড়ী যাবার জন্যে, না?

শ্যামসুন্দর হাসলো, দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, মা মারা যাবার পর এই তোমার কাছেই প্রথম সেবা পেলাম, সহানুভূতি পেলাম। মনে হচ্ছে, ওদের কাছ থেকে পাওয়া এত লজ্জা, এত অপমান, সব যেন সার্থক হয়েছে। আমি যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে না থাকতাম তা হ'লে......

বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইলো রাঙি।—বিয়ে করেন নি আপনি?

আত্মবিদ্রূপের হাসি হাসলো শ্যামসুন্দর। বললে, চেহারাটা দেখতেই পাচ্ছ, মেয়েরা আমাকে দেখলে ভয় পায়, ছেলেরা ঘৃণায় কাছে আসে না। তাছাড়া গরীবের ছেলে আমি, না আছে ভদ্রগোছের চেহারা, না আছে টাকাকড়ি। আর গুণের মধ্যে তো জানি শুধু ঘটকালির বিদ্যে। কে বিয়ে করবে আমাকে?

—সে কি, নিজে বিয়ে দিয়ে বেড়ান পৃথিবীসুদ্ধ লোকের, আর...

কথাটা বলতে গিয়েই থেমে গেল রাঙি। ভাবলে, কথাটা বলা হয়তো উচিত হবে না।

শ্যামসুন্দর শুধু হাসলো।

সে রাত্রে কিন্তু চলে আসতে পারলো না ও। আরো অনেক রাতে ফিরে এলেন রাঙির বাবা। বৃদ্ধ। কাঁচাপাকা চুলের রাশ মাথায়। মুখে একটা সৌম্য ভাব। কাঁধে চাদর আর চোখে পুরু কাচের চশমা। চটির শব্দে সচকিত হয়ে তাকালো শ্যামসুন্দর।

রাঙি বললে, দেখেছো বাপী। কপালটা একেবারে ফেটে গিয়েছে, দেখো নি তো, জামাটা রক্তে লাল হয়ে গেছে। আমার যেন চোখ ছলছল করে উঠলো রাঙির।

রাঙির বাবাও সহানুভূতির স্বরে বললেন, বেশ করেছিস মা, যেতে দিস নি ভালই করেছিস। এই অবস্থায় কি কাউকে যেতে দেয়া যায়।

শ্যামসুন্দরকে বললেন, আজকের রাতটা থেকে যাও বাবা, এতো তোমারই বাড়ী। বাড়ীঘর কি আর আলাদা আলাদা হয়, সুবিধের জন্য আমার বাড়ী তোমার বাড়ী করে ভাগ করা হয়েছে। আসলে সব বাড়ীই তো সকলের বাড়ী। লজ্জাই বা কিসের, আপত্তিই বা কেন!......কিন্তু রাঙি, তুইও আশ্চর্য লাগিয়ে দিলি আমায়...কি বলো বাবা?—এক ফোঁটা মেয়ে তুই এত সব একা একা করলি? সস্নেহে আত্মগর্বে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন।

রাঙি লজ্জায় আনন্দে মাথা নীচু করে রইলো।

—ভগবান শুধু তোর দাম বুঝলো না মা।

—তুমি খাবে চলো, রাত হয়েছে অনেক। রাঙি বললো।

তারপর। তারপর সেই নিঃশব্দ রাত। বাইরে অবিরল বৃষ্টির রিমঝিম। দু একটা বজ্রপাত, ঘনঘন বিদ্যুতের চমক। গভীর রাতের জমাট অন্ধকারে ঢাকা একটি বিচিত্র রাত্রি। আর সেই রাতের বুকে এক নিঘুম ক্লান্তি। দুটি নরম পায়ের হালকা আওয়াজ। কাপড়ের খসখসানি। একটি ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ। অন্তরঙ্গ দেহালাপ।

তারপর অন্ধকারের বুকে একটি কোমল কণ্ঠের ফিসফিসানি।

—একটা কথা মনে রাখবেন?

—কি?

—সব মেয়ে আপনাকে ভয় পায় না। সব মেয়ে আপনাকে ঘৃণা করে না।

এরপর শ্যামসুন্দরের নিজেরই দীর্ঘশ্বাস।

—আরেকটা অনুরোধ।

—কি ?

—আর কোনদিন আসবেন না।

বিস্ময়!

চিরকাল এ এক বিস্ময় শ্যামসুন্দরের কাছে। বুঝতে পারে নি, বুঝতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভাঙে নি ও। কোনদিন এ পথে আর আসে নি শ্যামসুন্দর। জীবনে একটিমাত্র মধুর দিন এসেছিল, একটি মাত্র রোমাঞ্চশিহরণ। ওর আকাশে রামধনু রচনা করেছিল যে, একদিনও তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে ইচ্ছে হয় নি শ্যামসুন্দরের।

রাঙির বাবা বিহারীবাবু ঠিকানা নিয়ে রেখেছিলেন শ্যামসুন্দরের। মাঝে মাঝে এসেছেন তিনি রামী ধোপানীর গলির এই মেসবাড়ীতে। দেখা সাক্ষাৎ করে গেছেন, অনুরোধ জানিয়েছেন শ্যামসুন্দরকে যাবার জন্যে, কিন্তু রাঙির কথা মনে পড়তেই চুপ করে গেছে ও, বিহারীবাবুর প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে।

তারপর বিহারীবাবুর আসাযাওয়ায় যতি পড়েছে একসময়। কাজের নেশায় ডুবে গেছে শ্যামসুন্দর, অর্থোপার্জনের নেশায় বিভোর হয়ে দিন, মাস, বছর কেটে গেছে।

বছর তিনেক পরে হঠাৎ এমন একটা অঘটন ঘটবে শ্যামসুন্দর জানতো না।

এই ছোট গলিটা খুঁজে বের করেছিল ও পথ সংক্ষেপ করবার জন্যে। ছোট সরু গলি, একটা বাড়ীর দেয়ালে পিঠ ঘষতে ঘষতে যেতে হয়। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তিন পাশে ছোট ছোট কয়েকখানা বাড়ী, আর ভাঙা পাঁচিলটা পার হলেই বড়ো রাস্তা।

প্রতিদিনই এ পথ দিয়ে যেত ও। বগলে ছাতা, হাতে খেরোর লাল খাতা, আর পায়ে চটি।

হঠাৎ পিছনে পিছনে একটি ছোট্ট ছেলে দৌড়ে এলো।—ও মশাই, ও মশাই।

সেদিনও হন্‌হন্ করে হেঁটে যাচ্ছিল ও।

চমকে ফিরে দাঁড়ালো শ্যামসুন্দর।

—আপনাকে ডাকছে যে! ভয়ে ভয়ে ছেলেটি বললে।

সন্ত্রস্ত চোখে তাকালো ও।—কে?

—ঐ ও-বাড়ীর রাঙিমাসিমা।

—কে? কে রাঙিমাসিমা? নামটা ভুলে যায় নি ও, কিন্তু ঠিক এই পল্লীতে রাঙিকে হয়তো আশা করতে পারে নি। তাই, ভেবেছিল কেউ হয়তো ছেলেমেয়ের বিয়ের জন্যেই ওকে ডাকছে।

ছেলেটির আঙুল লক্ষ্য করে চোখ ফেলতেই রাঙিকে দেখতে পেল ও। ভিজে ভাঙা কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রাঙি। কপাল অবধি ঘোমটায় ঢাকা।

কাছে এগিয়ে এলো শ্যামসুন্দর। রাঙির চোখ যেন ওকে হাতছানি দিচ্ছে। ঘোমটাটা আরো একটু টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকলো রাঙি, পিছনে পিছনে শ্যামসুন্দরও। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল ও, ভেবেছিল রাঙি হয়তো ভুলে গেছে, একটি রাত্রের ভুল মুছে ফেলেছে ওর জীবন থেকে।

শ্যামসুন্দরের মনে হলো রাঙি যেন অনেক বড়ো হয়েছে, বয়েস বেড়ে গেছে যেন বছরের হিসেব পার হয়েও। সেই শুচিশুভ্র বৈধব্যের বেশবাস তুচ্ছ করে কোথায় যেন একটা প্রাচুর্যের ছন্দ দোল খাচ্ছে।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়েছিল শ্যামসুন্দর। ভাবছিল, তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ একটা শব্দে চোখ তুললে। পরক্ষণে বিস্ময়ে চমকে উঠলো ও।

রাঙি। ফিরে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে রাঙি। কোলে তার একটি বছর দুয়েকের ছোট্ট শিশু। মিটিমিটি ঠোঁট টিপে হাসলো রাঙি। মাতৃত্বের স্নেহে আঁকড়ে ধরলো ছেলেকে।

আশ্চর্য।

হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেলো শ্যামসুন্দর। এত কুৎসিত, এমন বীভৎস চেহারার কোন শিশু ও দেখে নি এর আগে।

পুরোনো দিনের কয়েকটা দৃশ্য ভাসা ভাসা মনে পড়লো। চোখের সামনে ফুটে উঠলো না, মনের কোণে উঁকি দিলো না কোন স্পষ্ট আভাস। তবু, ভালো লাগা আর ভুলে যাওয়া কোন গানের সুরের মতই অনুভূতির তারে কি এক ক্ষীণ অনুরণনের রেশ যেন। রাঙি। সেই মুগ্ধ আর মোলায়েম চোখ, সেই অশ্রু টলোমল নিটোল মুখের নিকষ কৃষ্ণতা, শীর্ণকটি শরীরের প্রতিটি রেখাতরঙ্গে যৌবনের পূর্ণিমা। হ্যাঁ, ঠিক তেমনি স্নিগ্ধসুন্দর। হয়তো বা আরো সুপ্রকাশিত, আরো স্বতঃসম্পূর্ণ।

কিন্তু ঐ শুচিশুভ্র বৈধব্যের শ্বেতাবরণ, ঐ অপার্থিব রূপকে যেন ব্যঙ্গ করছে একটি কুৎসিত শিশুর মসীময় কৃষ্ণাঙ্গ।

প্রথম দৃষ্টিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলো শ্যামসুন্দর। শৈশবের আয়নায় নিজেকে দেখলো যেন ও। মুখে চোখে আকস্মিকতার ছায়া নেমেছিল ওর, সেটুকু চাপা দেয়ার জন্যে মুখে হাসি আনলে। রাঙির স্মিতহাস চোখের পাতা বুজে এলো ঠোঁট টিপে খুশীতে হেসে উঠলো ও।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো শ্যামসুন্দর।

ক্রমশ। ক্রমশ শ্যামসুন্দরের মনে হলো—না, কুৎসিত নয়, এ শিশুও সুন্দর। ওকে কোলে নেবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলো শ্যামসুন্দরের হাত দুটো, চঞ্চল হয়ে উঠলো ও।

অনেকগুলো ঘটনা পর পর মনে পড়ে গেল শ্যামসুন্দরের। মনে পড়ে গেল, ও নিজে কুৎসিত, ওর বীভৎস চেহারা দেখে ছেলে মেয়েরা ভয় পায়। 'ঐ অপয়াটার কাছে ছেলে নিয়ে যেতে হবে না'; 'ঐ ভালুকের মত চেহারা দেখলে ভয় পাবে না এক ফোঁটা মেয়ে'। না, অনেকবার প্রতিজ্ঞা করেছে শ্যামসুন্দর, প্রতিজ্ঞা ভুলে যাওয়ার জন্যে আঘাত পেয়েছে প্রতিবারই। আর ভুল হবে না, ভুলে যাবে না ও।

কিন্তু, এ যে ওর নিজের ব্যর্থজীবনের একমাত্র রোমাঞ্চময় সৃষ্টি। কোলে নেবে না? বুকে টেনে নেবে না ওর প্রাণাংশকে, স্মৃতিচিহ্নকে!

. নিজের অজান্তেই হাত বাড়ালে শ্যামসুন্দর। শিশুকে কোলে নেবার জন্যে হাত বাড়ালে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রগল্‌ভ হাসিতে খিলিখিল করে কৌতুকে গড়িয়ে পড়লো ছেলেটি। তারপর, তারপর ছোট ছোট দুটি নরম হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো শ্যামসুন্দরের কোলে। আনন্দে উন্মাদনায় সশব্দে হেসে উঠলো শ্যামসুন্দর, সজোরে আঁকড়ে ধরলো। সবল আর দৃঢ় আলিঙ্গনে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

এ যেন স্বপ্ন দেখছে শ্যামসুন্দর, কল্পনার রঙে রামধনু আঁকছে যেন। বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হবার নয়।

ওর চোখের হাসি ধীরে ধীরে রাঙির চোখে তৃপ্তির শিহরণ দিলো। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে, শ্যামসুন্দরের তৃপ্তিময় চোখের দিকে, আপন সন্তানের দিকে।

[১৩৫৭]

অ ঙ্গ পা লি

মাস আষ্টেকের একটি ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো সবিতা। ফিরে আসতে হলো। এক যুগ পরে। হিসেবে হয়তো বেশি দিন নয়, দেড় বছর কি আরো কম সময়। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর মধ্যেই ঘটে গেল কত পরিবর্তন।

কালো আকাশের অন্ধকার চিরে হঠাৎ একদিন আগুন জ্বলে উঠেছিল দিকে দিকে। আর •চীৎকার। রক্তপায়ীদের কোলাহল আর অসহায় মানুষের আর্তনাদ ভেসে উঠেছিল আকাশে বাতাসে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সবিতার। হঠাৎ-জাগা চোখে ভয় নেমেছিল ওর। বাবা মা ভাই বোন সকলের মুখের ওপর-দেখতে পেয়েছিল ও শঙ্কিত বিস্ময়ের ছাপ! ধোয়া চাদরের মত ফ্যাকাশে মুখে অপেক্ষা করেছিল ওরা। অপেক্ষা, অপেক্ষা। .তারপর। পশুর মত চোখে আর প্রেতের মত শরীর নিয়ে এগিয়ে এসেছিল তারা। সেই ছায়া-কালো-কালো মানুষগুলো। বাইরে শুধু অন্ধকার আর কালির বৃষ্টি, কিন্তু বৃষ্টির রিমঝিম রিমঝিম ছাপিয়ে ভেসে আসছিল ক্রুদ্ধ জনতার মদো রক্তের চীৎকার। ওরা এগিয়ে এলো। কারো হাতে মশাল, কেউ বা কৃপাণপাণি। তারপরও কি যেন ঘটেছিল। ভাল করে মনেও পড়ে না সবিতার। হয়তো বা চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল ও। বোবা আর বোকা চোখ চেয়ে অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখছিল। রক্ত আর রক্ত।

বাবা, মা, ভাই, বোন। কতদিন, কত কর্মহীন বিষণ্ণ দুপুর কাটিয়েছে ও ভেবে ভেবে, কত না নিঘুম রাত! তারা কি বেঁচে আছে? সবিতার জীবন থেকে অন্তত মুছে গেছে তারা। কে জানে, ওকে বাদ দিয়েই হয়তো নানা রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে ওদের সংসার। বংশের সাদা ফুটফুটে পাখনাটার ওপর যে কালির চিহ্ন পড়েছিল সেটুকু মুছে ফেলে আবার হয়তো নতুন সংসার গড়ে তুলেছে ওরা। সবিতাকে ভুলে গেছে। সবিতাও ভুলতে চেষ্টা করেছিল ওদের। কি হবে মিথ্যে দুঃখ করে। ব্যর্থ অনুশোচনায়। হঠাৎ একদিন ও আবিষ্কার করলে, মাতৃত্বের স্নিগ্ধাবেশে ওর দেহ ভরে উঠেছে। চোখে মধুময় ক্লান্তি।

অবাঞ্ছিত, অযাচিত হতে পারে। স্নেহ আর ভালবাসা নয়, ঘৃণা আর বিদ্বেষের বিনিময়ে পাওয়া সন্তান। তবু। সব অপরাধ যেন ক্ষমা পেল সবিতার কাছে। ওর আপন দেহের রক্ত মাংসে গড়া সন্তানকে বুকের দুধ দিয়ে বড় করে তোলবার চেষ্টা করলে ও, স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো।

এমন সময় ডাক এসে পেঁছিলো। পুলিসের সাহায্যে কারা যেন উদ্ধার করলো ওকে।

তারপর।

আট মাসের শিশুটিকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো সবিতা।

ক্লান্ত বিষণ্ণ দেহ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সবিতা। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পাথরের মূর্তির মত।

ধুলো উড়িয়ে ঝড়ের মত সশব্দে চলে গেল পুলিশের গাড়ীখানা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবার চোখ তুলে তাকালো ও মা-র মুখের দিকে। পরক্ষণেই মাথাটা ঝুঁকে পড়লো ওর, চোখ নিবদ্ধ হলো পায়ের দিকে। মুখ তুলতেও কেমন এক অস্বস্তি।

—আয়।

ছোট্ট একটি অভ্যর্থনার ডাক। হয়তো আন্তরিক, হয়তো বা উপায়হীন। সবিতা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। আরেকবার চকিতে চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ, মা-র চোখে চাপা কান্নার অশ্রু। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো মা-র শরীরে বেশবাসের দিকে তাকিয়ে। নেই? বাবা নেই? দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা টিপে টিপে একটু এগিয়ে গেল সবিতা।

কপাটে ঠেস দিয়ে ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে আছে ছোট বোন কবিতা। এগার বছর বয়সের মেয়ে, কিছুই চেনে না, কিছুই বোঝে না, তবু কেমন এক অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে। ওর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হাসলে সবিতা।

কথা খুঁজে পাচ্ছে না ও। কি বলবে, কি-ই বা প্রশ্ন করবে? তার চেয়ে একেবারে চুপচাপ থাকা ভাল। কথা বললেই তো পাশ থেকে একটা কথাই খোঁচা দেবে। মনে পড়বে, মনে পড়িয়ে দেবে ওর অতীতের গ্লানির দিনগুলোকে।

মা বললে, বোস, এখানে। আর নয়তো যা কলঘর থেকে হাত মুখ ধুয়ে আয়। জিরিয়ে নে একটু। আমি জল খাবারের ব্যবস্থা করি গে।

নিজের মনেই হাসলে সবিতা। উত্তর দিল না। লজ্জা আর অস্বস্তি ওর একার নয়। মা ওর চোখের সামনে থেকে সরে যেতে চায়, সরে থাকতে চায়।

মা চলে যেতেই কবিতাকে কাছে ডাকলে ও।

মৃদু হেসে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলো।—কেমন আছিস?

কবিতা ঘাড় নাড়লে, অর্থাৎ ভালই।

—দাদা?

ছোট্ট একটি কথা। কি অর্থ ওর? যে কোন অর্থ ধরতে পারে কবিতা। দাদা কোথায়, দাদা কেমন আছেন! কিংবা, দাদা আছেন কি?

চমকে চোখ তুললে কবিতা। সবিতা বিষণ্ণ হাসি হাসলে।—ও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার প্রশ্ন করলে, বকু? বকুও নেই?

—ছোড়দা কলেজে গেছে।

যাক। আছে তা হ'লে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো সবিতা। জোর করে হাসলে, খুশীতে নেচে ওঠবার চেষ্টা করলে। মিলেমিশে যেতে হবে। ঠিক আগের দিনের মতই। হয়তো অস্বাভাবিক মনে হবে ওর ব্যবহার, চোখে লাগবে। তবু, মাঝখানের দেয়ালটা সরিয়ে ফেলতে হবে। দূরে দূরে থাকলে দূরের মানুষ হয়ে যাবে ও। সে আরো কষ্টকর, অসহ্য।

হাসিখুশী মুখে কোলের শিশুর গাল টিপে আদর করলে সবিতা, চুমু খেলো।

হাসতে হাসতে বললে, ড্যাবড্যাব করে দেখছিস কি দুষ্টু? চিনিস, একে চিনিস তুই?

কবিতাও হেসে হাত বাড়ালে। ওর কোলে ছেড়ে দিলো ও ছেলেটাকে। তারপর ছেলেকে আদর করতে করতে কবিতাকে জড়িয়ে ধরলো। যেন ওর ছেলেকেই আদর করছে সবিতা। বাঁ হাতটা কবিতার কাঁধের ওপর দিয়ে গিয়ে শিশুর চুলে বিলি দিতে শুরু করলে। কবিতার পিঠের ওপর বুকের চাপ পড়লো ওর। কবিতা বুঝলো না। ছোট ছেলেপিলে দেখলেই মেতে ওঠে ও। এ তো দিদির ছেলে! সবিতার কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছিল, খুব ইচ্ছে হচ্ছিল কবিতাকে জড়িয়ে ধরতে। বুকের কাছে টেনে আনতে চায় ও কবিতাকে। এতদিন পরে আবার আপন করে, অন্তরঙ্গভাবে ফিরে পেয়েছে ও ছোট্ট বোনটিকে! খুশীতে চঞ্চল হয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর।

হাঠাৎ মা-র পায়ের শব্দে মুখের হাসিটা ওর থমকে গেল। চট করে ছেলেকে কোলে তুলে নিলো ও। এত রঙ, এত রসিকতা, এত আনন্দ হয়তো মার চোখে দৃষ্টিকটু লাগবে।

মা এসে দাঁড়ালো একটু পরেই।

শিশুর দিকে আবার হাত বাড়িয়ে কবিতা বললে, কি সুন্দর চোখ দুটো, দেখো মা। কেমন দুষ্টুমির হাসি দেখছো?

খুশীর ছোঁয়াচ লাগলো হয়তো, মাও হাসলো।

কবিতা জিগ্যেস করলে, কত বয়স হলো দিদি এর?

সবিতা উত্তর দিলো না প্রথমবারে। মার সামনে ওর কেমন এক অস্বস্তি।

কবিতা আবার প্রশ্ন করলে।

উত্তর এলো, শুকনো উত্তর। —আট মাস।

—ও মা। মাত্র আট মাস! কি ভারী বাবা, কোলে রাখা যায় না। কেমন নাদুসনুদুসটি হয়েছে, না মা? আমি ভেবেছিলাম এক বছর দেড় বছর হবে।

মা বা দিদির কাছ থেকে কোন কথা যে শুনতে পেল না ও, কবিতার সেদিকে লক্ষ্যই নেই। ও কথার পর কথা বলে চলেছে।

—কি নাম রেখেছো দিদি?

—নাম নেই। শুকনো গলায় উত্তর দিলো সবিতা।

অর্থাৎ, নাম যেটা আছে, সেটা বলা চলে না।

কবিতা এদিকে বিস্ময়ে চোখ গোল করলে, নাম দাও নি এখনো? কেমন হাসিখুশী দেখছো মা। আচ্ছা, কি নাম দেবে বল তো? হয়েছে, ওবাড়ীর বৌদি নাম দিয়েছে হাসি, এর নাম দেবো খুশি। খিলখিল করে হেসে উঠলো কবিতা।

তারপর শিশুর দিকে তাকিয়ে বললে, হাসির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো বুঝলে খুশি? রাঙা টুকটুকে দেখতে। কাল আনবো, দেখো।

সবিতা গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করছিল। তবু পারলে না। ক্রমে ক্রমে একটা হাসি ফুটে উঠছিল ওর চোখে।

মা বললে, যা সবি, হাত-মুখ ধুয়ে আয়।

কবিতা হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বললে, কেমন দিদিমা বাপু তুমি, নাতিকে কোলে নিলে না সেই থেকে!

মা হেসে হাত বাড়ালো।

কলঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল সবিতা। দোরের আড়াল থেকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে, মা কোলে নিলো ওকে।

• সবিতার বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। ঘুঙুরের বোল ফুটলো বুকের মধ্যে।

স্নান সেরে এসে সবিতা দেখলে খুশি তখনো মার কোলে। কবিতা কাড়াকাড়ি করছে, কিন্তু না, মা কিছুতেই দেবে না।

ঠোঁট টিপে টিপে হাসলে সবিতা। চোখ ভরে, প্রাণ ভরে দেখলে।

মাকে ওর ভয় ছিল। মার শুচিবাই ওর অজানা নয়! তাই আশঙ্কা ছিল। পুলিস যখন ওকে উদ্ধার করতে যায়, হাত-পা ধরে অনুনয় করেছিল ও। বলেছিল, আমি তো বেশ সুখেই আছি ফিরে যেতে চাই না। আর ফিরে গেলেই বা মা বাবা আমাকে ফিরে নেবেন কেন? আমার জাত নেই, ধর্ম নেই। আমি তাদের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে গেছি।

ওরা শোনে নি। আইন—আইনের দোহাই পেড়েছিল। মা-বাবা গ্রহণ না করলেও, অনাথ আশ্রম আছে সে ভরসা দেখিয়েছিল।

সে কথা ভেবে সবিতার হঠাৎ মনে হলো মাকে সে চিনতো না। আজই প্রথম চিনলো যেন।

মানুষ কত বদলে যায়। সবিতা ভাবলে। মনে পড়লো ছোট-বেলাকার কথা। ইস্কুল থেকে ফিরে কাপড় না ছাড়লে মাকে ছুঁতে পেত না ও, ঘরের জিনিসপত্তরে হাত দিতে পেত না!

সবিতা এবার মুখ খুললো। —একটু চা করে দিবি কবি?

মা ফিরে তাকালো। —বস্, খাবার নিয়ে আসছি।

মা চলে গেল খাবার আনতে।

বিকেলের রোদ কমে এসেছে তখন। রাতের ছায়া নামছে ধীরে ধীরে। বই বগলে বকু ফিরে এলো। —দিদি, তুই?

হ্যাঁ, আমি। সবিতা হাসলে। বললে, ভূত ভেবেছিলি বুঝি?

বকুও হাসলো। বললে, আমরা ভেবেছিলাম, তুই মরে গেছিস।

—তা হলেই ভাল হ'ত, না?

—দূর। মরে কোন আরাম নেই।

সবিতা হেসে বললে, পড়াশুনা করছিস আজকাল, না আগের মতোই?

বকু উত্তর দিলে, এতো আর ইস্কুল নয়। কলেজে ভরতি হয়েছি। না পড়লে চলে?

—তাই বুঝি? সবিতা হাসলে।

কবিতা ফোড়ন কাটলে, পড়ে না ছাই। শান্তদার সঙ্গে আড্ডা দেয় দিন রাত।'

—দিই তো দিই। কবিতাকে ভেংচি কেটে বই রাখতে গেল বকু।

আর জলযোগ সেরে বারান্দার ডেকচেয়ারটাতেই শুয়ে পড়লো সবিতা। সারাদিনের ক্লান্তি আর অবসাদে সারা শরীর টনটন করছে। তাছাড়া ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলে সবিতা। চোখ বুঁজে পড়ে থাকতে থাকতে ঘুমে ঢলে পড়লো।

সন্ধ্যা নামলো। বাতাস থামলো। তারাজ্বলা অন্ধকারের আকাশে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো চাঁদ। কৃষ্ণচূড়ার ডালপালার ফাঁকে কোথায় একটা কাক বসে পাখা ঝটপট করছে। চিঁচিঁ শব্দ তুলে কয়েকটা চামচিকে উড়ে গেল।

সবিতা শুনতে পেল না। দেখতে পেল না। ঘুমের ঘোরে ওর মাথাটা কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে।

বার কয়েক এসে ফিরে গেল কবিতা আর বকু। বসে বসে গল্প করবার সাধ ওদের। অনেক অনেক কথা শোনবার আছে। বলবার আছে। দেড়টা বছর যেন একটা যুগ। কত কি ঘটে গেল, কত কি বদলে গেল। সে সব কি শুনবে না ওরা, বলবে না? কিন্তু। না, শ্রান্ত দেহ মন সবিতার। ঘুমুক ও। ঘুম ভাঙাবে না ওরা। ঘুম তো ভাঙবেই, নিজের থেকেই জেগে উঠবে একসময়।

কি একটা শব্দে চোখ খুললে সবিতা। উঠে বসলো।

রাত ঘন হয়ে এসেছে। নির্জন নিশ্চুপ রাত। সামনের রাস্তাটার দিকে তাকালে সবিতা। দূরের আর অদূরের বাড়ীগুলোর দিকে। আকাশের দিকে।

চাঁদের গায়ে কুয়াশার মত স্বচ্ছ মেঘের ওড়না। নীচের রাস্তাটা চকচকে ইস্পাতের মত পড়ে আছে নির্জন। এবাড়ী ওবাড়ীর দু-একটা জানালায় এখনো আলো জলছে।

উঠে দাঁড়ালো সবিতা। গলাটা শুকিয়ে গেছে।

ও নিজেই কি গিয়ে জল গড়িয়ে নেবে? না, কবিতাকে ডাকবে?

হাল্কা পায়ে একটু পায়চারি করলে সবিতা। বারান্দাতেই খুশি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকটা শিরশির করছে যেন। দুধ খাওয়ানো হয়নি খুশিকে। নাকি, বোতলের দুধ খাইয়েছে ওরা।

ঘরগুলো অন্ধকার। ভেতরের উঠোনে এক ফালি আলো।

আস্তে আস্তে বাড়ীর ভেতর পা বাড়ালে ও।

খানিকটা এসেই থমকে দাঁড়ালো। অন্ধকারে কপাটের আড়ালে।

ভিজে কাপড়ে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর বকু।

বকু বললে, এমনি অসুখ তোমার, আবার এত রাতে চান করলে?

মা লজ্জিত হয়ে বললে, কি করবো বল্। সারাটা দিন ছেলেটাকে নিয়ে মাখামাখি করলাম।

—করলেই বা। অবোধ্য অভিমান বকুর গলায়।

মা মুখে বললে, কোলে করে মানুষ করছে বলে তো আর আমাদের ছেলে নয় বাপু!

[১৩৫৬]

জবানাহর

নিশুতি রাত নয়, রাত সাড়ে দশটা, কিংবা কে জানে এগারোটাও হতে পারে, যখন আর কি সব বাড়ীর আলো নিভে যায়, চারিদিক চুপচাপ, ল্যাম্পপোস্টগুলো ঘুমে ঢুলতে থাকে, থেমে যায় উঠোন ধোয়ার সপ্‌সপ্‌ শব্দ, অসাবধানী ঝিয়ের হাতের বাসন গোছানোর ঠুং ঠাং বা ঝনঝনানি আর বাজে না, যখন কচি ছেলের মা কাঁচা ঘুমের কান্না থামাতে ছেলেকে ঘুম-ঘুম চোখে দুধ খাওয়ায়, বুকের নয়তো বোতলের, যখন কিনা অনেক অন্ধকারের ওড়নায় পৃথিবীর মুখ ঢাকা পড়ে, আতঙ্কিত কালো রাতের পথে অজানা রহস্যের পদধ্বনিটুকুও শোনা যায় না ছাদের কার্নিসের আর রাস্তার মোড়ের শিশু গাছের আড়ালে চোরা বিশ্রম্ভের অভিসার-আলাপ ফিসফিস করে না, যখন অশ্লেষশয়না নব দম্পতির অধরে ওষ্ঠে ঘটে মিলন, রাত মজে আসে যখন, তখন হয়তো কাঁকুলিয়ার সড়ক ধরে যেতে যেতে আপনি মেয়েলী কণ্ঠের একটি তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন।

সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটি নরম কণ্ঠের ব্যথাহত চীৎকার হয়তো শুনেছেন আপনি। এ পথের যে কোন হঠাৎ-পথিকের কানেই এ কান্না বেজে ওঠে। বাতাস থমকে থেমে পড়ে এই মুহূর্তে, রাস্তার আলোর সারিও হয়তো চমকে চোখ তোলে, আর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস একটি মেয়ের সারা বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসে।

সেদিন দূরের ট্রাম ডিপোর ঘণ্টা তখনো এগারোটা বাজার সঙ্কেত জানায় নি। আর পড়শীদের চোখে তন্দ্রা ঘন হয়ে ঘুম হয় নি।

হ্যাঁ। চাঁদ ঢলে পড়েছিল। বাতাস বিলি দিচ্ছিলো গাছ-গাছালির গায়ে। পাড়ার শেষ-জাগরী পরীক্ষার পড়া-পড়ুয়া মেয়েটাও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে তখন।

জানালার পর্দাটা সরিয়ে, গরাদের ফাঁকে গাল চেপে অপেক্ষা করছিল শ্যামলী। থমথমে অন্ধকারে শ্যামলীর বোবা যৌবন প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলো।

ইন্দ্রনাথ।

অদূরে যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেল শ্যামলী। আশায় আশায় চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ, রাস্তার মোরম মাড়িয়ে কে যেন আসছে। ভারী পায়ের জুতোর শব্দ শুনতে পেল ও। এক টুকরো মরা হাসির বিদ্যুৎ যেন দেখা দিল ওর মুখে, একটি মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর চোখ।

ইন্দ্রনাথই।

দোরের দিকে ছুটে গেল শ্যামলী। তার আগেই অধৈর্য হাতের কড়ানাড়ার আওয়াজ বেজে উঠেছে। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলে ও। ইন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকলো। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ। নাকে আঁচল চেপে কপাটে খিল দিলে শ্যামলী। তারপর ইন্দ্রনাথের ভারী চেহারার পেছনে পেছনে এসে ঘরে ঢুকলো।

আলোটা জললো, নিভলো।

তারপরেই করুণ কাকুতি-ভরা ভীতচকিত চীৎকার!

শিউলির দীর্ঘশ্বাসটা শুনতে পেল সুরঞ্জন। চোখ না চেয়ে মৃদুভাবে শিউলির পিঠের ওপর হাতটা রাখলো। সান্ত্বনা। সহানুভূতি।

সুরঞ্জনের হাতটা আঁকড়ে ধরলো শিউলি। কান্নায় কাঁপছে ও, সুরঞ্জন বুঝতে পারলো। তবু। উপায় কি!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ যেন ফুঁপিয়ে উঠলো শিউলি। গলার স্বর শুনে তাই মনে হলো সুরঞ্জনের।

—এর একটা বিহিত করতেই হবে। মরে যাবে মেয়েটা।

আজ নয়, কাল নয়। প্রতিদিন। ঐ একই ঘটনা ঘটে আসছে। আর শিউলির বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসে একটি দীর্ঘশ্বাস। —একটা বিহিত করতেই হবে। কিন্তু ও কি করতে পারে? কি করতে পারে ওরা!

শিউলি বলেছে, এ নরকে থাকা কেন তোর। বাবার কাছে চলে যা, শ্যামলী।

শ্যামলী হেসেছে। —কোথায় যাবো! পুরুষমানুষ অমন একটু-আধটু হয়ই!

শিউলি চটে গেছে, বলেছে, তুই আর আমাকে পুরুষমানুষ চেনাস না, তোর দু বছর আগে বিয়ে হয়েছে আমার।

হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে পড়ে শ্যামলী। ব্যথার হাসি হাসে। অর্থাৎ

ইন্দ্রনাথ আর সুরঞ্জন, তফাতটা নতুন করে চোখে পড়ে। শিউলিও বুঝতে পারে। অজান্তে আঘাত দিয়ে ফেলেছে শ্যামলীকে।

সান্ত্বনার সুরে বলে, ওকেই বা দোষ দেব কি। দোষ তো ওর নয়, দোষ নেশার।

শ্যামলী হাসে। — না দিদি, আমার অদৃষ্টের।

এর পর আর কি বলবে শ্যামলী। কথাটা তো মিথ্যে নয় যে প্রতিবাদ করবে! তাই ফিরে এসে সুরঞ্জনকে ধরে, আমার কথায় ও কান দেয় না। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো।

শিউলির ছোট বোন শ্যামলী। তার সঙ্গে সুরঞ্জনের সম্পর্ক সুখের, আনন্দের। আমোদমৈত্রীর। ব্যথার, ব্যর্থতার কথা তার সঙ্গে আলোচনা করবে কি করে সুরঞ্জন।

—তবে চলো, আমরাই উঠে যাই কোথাও। অভিমান করে শিউলি।

সুরঞ্জন হাসে। ও জানে, শিউলি তা পারবে না। ইন্দ্রনাথ যখন এখানে বদলি হয়ে এলো, তখন থাকার জায়গা পায় নি সে। বাসা খুঁজে পায় নি। শিউলি, শিউলিই তো তখন জোর করে ডেকে আনলো ইন্দ্রনাথকে। সুরঞ্জনকে বললে, নীচের তলাটা এমনি পড়ে থাকে, না হয় আমার বোনকেই ভাড়া দিলে।

সুরঞ্জন বলেছিল, শোনো শ্যামলী, দিদিটি তোমার কি স্বার্থপর। নিজে বিনা ভাড়ায় রয়েছে আর তোমার কাছ থেকে ভাড়া নিতে বলছে।

শ্যামলী কিন্তু রাজী হয় নি। ভাড়ার অংকও একটা ঠিক হয়েছিল। দু চার মাস ঠিক তারিখেই সে-টাকা দিয়ে গেছে শ্যামলী। তারপরও দু-চার মাস। হাতের কঙ্কণ, কানের দুল কোথায় গেল তা না হলে! হ্যাঁ, শিউলি এ খবর যেদিন আঁচ করতে পেরেছে. সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে সে-পথ।

তবু ইন্দ্রনাথকে ফেলে রেখে যেতে চায় না শ্যামলী। কেন, কে জানে। হয়তো দিনের সুমধুর অংশটুকুর লোভেই।

সত্যি। দিনের বেলায় ওদের দেখলে মনে হয় না, জীবনে ওরা ছন্দ হারিয়েছে।

ইন্দ্রনাথকে কিছু একটা বলবে, মনে মনে ঠিক করে এসেছিল শিউলি।

উঠোনে একটা মোড়ার ওপর বসে দাড়ি কামাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ, আর অদূরে চা ছাঁকছিল শ্যামলী। কি একটা ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছিল দুজনের মধ্যে। দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলে শিউলি। মনটা খুশীতে ভরে উঠলো ওর। কিন্তু। ও জানে, দুপুর শেষ হতে না হতে

কিসের আতঙ্কে শ্যামলীর চোখে ভয় জেগে ওঠে; ও জানে, এ মিঠে মিতালির আয়ু সূর্যমুখী ফুলের মতই দিনাবদ্ধ। শেষ রোদ্দুরের সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে যায় শ্যামলীর সুখের শিশির। না, ইন্দ্রনাথকে কিছু একটা বলতেই হবে। মনে মনে শক্ত হয়ে নিলো শিউলি। তারপর একটু শব্দ করে ঘরে ঢুকলো।

ইন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি মোড়াটা ছেড়ে দিলে। সশ্রদ্ধ হাসি হেসে বললে, বসুন।

—বসতে আসি নি। একটু রুষ্ট ভাব ফোটাবার চেষ্টা করল শিউলি।

বিস্ময়ের চোখ তুললে ইন্দ্রনাথ'

—বলছিলাম, শিউলি আমতা আমতা করে বলে, এত রাত করে বাড়ি ফেরো কেন? সোজা আর সরল কথাটা বলতে বোধহয় বাধলো। বললে, আপিসের ছুটির পরে বাড়ী ফিরলেই তো পারো।

দিদির দিকে বিরক্তির চোখে একবার তাকিয়ে চায়ের পেয়ালাটা রেখে শ্যামলী পাশের ঘরে চলে গেল। ওর দুঃখ কম নয়, কষ্ট কম নয়। কিন্তু, অন্য কেউ, বিশেষ করে শিউলি এসে সহানুভূতি দেখাবে বা ইন্দ্রনাথকে উপদেশ দিতে আসবে—এ যেন অসহ্য ঠেকে শ্যামলীর কাছে।

—মেয়েরাও মানুষ, ইন্দ্র। স্বামীর কাছে একটু মায়া অন্তত তারা আশা করে। তুমি শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, আমি আর কি বলবো।

শিউলির অনুরোধের স্বর যেন ওর বুক ছুঁয়ে গেল। চমকে চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ, শিউলির চোখের কোণে কি যেন!

আত্মধিক্কারের লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলো ইন্দ্রনাথ।

দিনের আলোয় শ্যামলী আর ইন্দ্রনাথ কত সুখী। হাসাহাসি, হৈ-হল্লা। ফুর্তিতে আর ফুরসতে যেন ডুবে আছে দুজনে। অথচ সূর্য নিভলেই নেশায় ডুবতে চায় কেন ইন্দ্রনাথ? সংসার ভুলতে চায় কেন? হ্যাঁ, যৌবনে কে যেন স্পষ্ট একটা ছবি এঁকে রেখে গেছে ওর মনে। মনের পটে দুলে দুলে ওঠে অপূর্ব সুন্দর একটি প্রবঞ্চনার মূর্তি। তাকে ভোলবার জন্যেই হয়তো!

শ্যামলী! হ্যাঁ, শ্যামলীকে ও অন্তরের অঙ্গ করে নিয়েছে। নিতে চায়। ঠিক বিয়ের পবে কয়েকটা মাস কত খুশিয়ান স্বপ্নে বিভোর হয়ে কাটিয়েছিল ওরা। শ্যামলীর অসুখের কয়েকটা দিন। আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় ইন্দ্রনাথের। একটি মুহূর্তের জন্যেও কাছ ছাড়া হতে পারতো না সে। আশা আর আশঙ্কা। স্থির চোখে চেয়ে দেখতো

শ্যামলীর রোগপাণ্ডুর মুখ। মাথায় আইস-ব্যাগ ধরে না-নিদ রাত কাটিয়ে দিতো।

কত মিষ্টি হাসি, মধুর কথালাপ। ভরসা দিয়ে বাঁচিয়ে তুললো ও শ্যামলীকে। সে-সব দিন কোথায় হারিয়ে গেল। কে জানে।

না। অনেক ভাল মেয়ে শ্যামলী। নরম মনের মেয়ে।

কিন্তু।

সন্ধ্যা হতে না হতে কিসের ডাক শুনতে পায় যেন ইন্দ্রনাথ। নেশার! সব ভুলে যায় ও।

দোতলার জানালা থেকে দেখতে পায় শিউলি। আবছা অন্ধকারের রাস্তায় টলতে টলতে আসছে ইন্দ্রনাথ।

কপাট খুললো, কপাট বন্ধ হলো। ভয়ে আশঙ্কায় বুক দুলে উঠলো শিউলির। চোখ ঠেলে কান্না এলো।" ওর হাত কাঁপছে, পা টলছে। রাগে, ব্যথায়, দুঃখে। তবু। তবু তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নমে এলো শিউলি। তারপর মাপঝথেই থমকে দাঁড়িয়ে রইলো।

সপ্‌সপ্‌ করে দু-বার শব্দ হলো। বেতের? শ্যামলীর নরম পিঠের ওপরই কি পড়লো নাকি? হ্যাঁ, আবার বাতাস চিরে ভেসে উঠলো শ্যামলীর কান্না। কান্না, কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, না কান্না চাপা দেবার চেষ্টা করছে?

—চুপ। ইন্দ্রনাথ গর্জন করে উঠলো।

আর সত্যিই চুপ করে গেল শ্যামলী।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের গলার স্বর শুনতে পেল শিউলি। —চুপ হারামজাদী। দিদির কাছে গিয়ে লাগাবি আর?

রাগে ফোঁসফোঁস করছে ইন্দ্রনাথ, শিউলি শুনতে পেল।

শুনতে পেল ইন্দ্রনাথ বলছে, আমি নেশা করি? আমি মারধোর করি?

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না শিউলি। ছুটে ওপরে উঠে এলো। এক ছুটে। এসেই বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

শ্যামলীর উপকার করতে গিয়ে একি করে বসেছে সে!

সকালে ওপরের বারান্দা থেকে শিউলি দেখতে পেল শ্যামলীর পিঠের ওপর আড়াআড়িভাবে দুটো কলশিটের দাগ। বেতের আঘাতে দুটো বেগনী রেখা ফুটে উঠেছে। পিঠের কাপড় সরিয়ে কি যেন লাগাচ্ছিল শ্যামলী, শিউলি দেখতে পেল।

না। আর কোনদিন কিছু বলবে না সে ইন্দ্রনাথকে।

শেফালী আর শ্যামলী। দুবোন, বন্ধুও। আদরে আহ্লাদে ক্রোধে কান্নায় একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। কৈশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধন। • যৌবনের চলচ্চতা। হ্যাঁ, ওদের একজনের প্রথম যৌবনের উৎসুক আবেশ আর ব্যর্থ বিহ্বলতা আরেকজনের কাছে গোপন থাকে নি।

রেলিংয়ের থামটায় ঠেস দিয়ে ভাবছিল শিউলি। ভাবতে বসলেই কত কথা মনে পড়ে যায়!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস চোখ চেয়ে তাকালো শিউলি। দূরের আকাশের দিকে।

বিকেল ঝরে পড়ছে। পাড়াটা এমনিতেই নির্জন, নিস্তব্ধ। আজ যেন আরো নিশ্চুপ, আরো জনহীন মনে হলো। ছোট ছোট বাড়ীর সারি, পথের পাশে পাশে নাম-না-জানা গাছের ছায়া। শালিকের ডাক, চড়ুই পাখির হঠাৎ পাখা নাড়ার আওয়াজ। আর আকাশে মিইয়ে আসা রোদের ঝিকিমিকি। কেমন একটা ক্লান্ত বিষণ্ণ হাওয়া দুলছে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস যেন পৃথিবীর পাঁজরের তলায় চমকে চুপ করে গেছে।

চোখের মত মনটাও উদাস হয়ে যায় শিউলির। খেয়াল থাকে না, কখন নিজেরই অজান্তে ছোট মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়েছে। তিন বছরের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়ের দেহভারটুকুও টের পায় না।

ঠাণ্ডা মেয়ে খুশি। তবু কতক্ষণ আর চুপচাপ থাকতে পারে। মা-র বুক নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করলে নিজের মনেই। তারপর কি যেন বললে। শিউলির কানে গেল না।

ও তখন ভাবছে ছোটবেলাকার কথা। শিউলির সেই অসুখের সময়। কতই বা বয়স তখন ওর। শিউলির হাতে ইন্‌জেকশনের ছুঁচটা ফোটাতে দেখে চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল শ্যামলী। যেন ওরই হাতে ফুটলো ছুঁচটা। সেদিন ওর ভয় দেখে হেসেছিল শিউলি! তারপর। অনেক দিন। রোগশয্যায় পড়ে পড়ে শিউলি বুঝি ভাত খাবার বায়না ধরতো! তাই শ্যামলী একদিন লুকিয়ে ওর জন্যে মাছ আর ভাত নিয়ে এসে দিয়েছিল।

বলেছিল, দিদি, খেয়ে নে। মা ছাদে গিয়েছে, জানতে পারবে না।

মনে পড়লে হাসি পায় আজ।

শিউলির হাতে একটা ফোড়া হয়েছিল একবার। শ্যামলীরই বয়স তখন পনেরোর কাছাকাছি। ফোড়াটা কাটানোর সময় শ্যামলী কাছেই ছিল।

হঠাৎ, শুধু রক্ত দেখেই কি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল শ্যামলী?

অনেক, অনেক কথা মনে পড়ে শিউলির। দূরের দিগন্ত থেকে উদাস চোখ আর ফিরে আসতে চায় না। চোখে আর নাকে খুশির নরম হাল্কা হাতের স্পর্শে তন্ময়তা ভেঙে যায়। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুশির মুখটা গালের ওপর চেপে ধরে।

আদর পাবার মত, আদর করবার মত শ্যামলীর কোলেও যদি একটা কেউ থাকতো! শিউলির ভুলের জন্যেই হয়তো চটে আছে শ্যামলী। খুশিকে নিতে আসে নি আজ আর। কৌতুকের হাসি হেসে খুশিকে কোলে নিয়ে তরতর করে নীচে নেমে যায় শিউলি। তারপর শ্যামলীর পিঠের ওপর ওকে ঝুপ করে নামিয়ে ধরে বলে, মাসী মাসী করে সারা হলো ও, আর মাসীর সাড়াই নেই।

শ্যামলীও হেসে ওকে কোলে তুলে নেয়।

কিছু সময় খুশিকে নিয়েই কেটে যায় শ্যামলীর। আদর করে, শাসন করে।

কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেই কেমন যেন বিষণ্ণ দেখায় ওকে। চোখের তারায় ভেসে ওঠে কেমন এক ধোঁয়াটে দৃষ্টি।

তারপর। তারপর শিশুসন্ধ্যা ক্রমশ রাত হয়। রাত গভীর হয়। এপাশের ওপাশের বাড়ীর আলো নিভে যায়। আওয়াজের দমক মিইয়ে আসে। আবার সেই নির্জন, নিস্তব্ধ রাত্রি। ঈষৎ হাওয়ায় জানালার পর্দা ভাঙে, শুকনো পাতার শব্দ ভাসে। কালো কালো পীচের রাস্তা, কালো কালো গাছের গুঁড়ি। আর চাঁদের ছায়ায় ভেজা নির্জীব ইঁট-কাঠ-কংক্রিটের তাঁবুগুলো পড়ে থাকে নিঃশব্দে। আকাশের কোণে হয়তো মেঘ জমে, চাঁদ আড়াল পড়ে। তারাজ্বলা দুধেলা বীথিটাও নিষ্প্রভ হয়। শুধু দু-একটা রেতো বাদুড়ের ডাক শোনা যায়। আর দূরের ক্বচিৎ ট্রামের ঘণ্টি।

জানালার গরাদ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে শ্যামলী। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকে ওর দৃষ্টি। অন্ধের মত। কোন কিছুর দিকেই যেন চোখ যায় না ওর। আশা আর আকাঙ্ক্ষায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করে ও।

সিল্যুটের ছবির মত একটা সুদৃঢ় চেহারা দেখা যায়। অসংযত পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে আসছে ইন্দ্রনাথ। শ্যামলী দেখতে পায়। আর পরমুহূর্তেই ছুটে যায় দরজা খুলতে।

ইন্দ্রনাথ ঘরে ঢোকে। কপাটে খিল লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় শ্যামলী। আর

ইন্দ্রনাথের চোখের দিকে তাকিয়েই ভয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। সেই অতিপরিচিত নৃশংস দৃষ্টি ইন্দ্রনাথের চোখে। অন্ধকারে যেন দুটো অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠলো ধক করে। রক্তলোলুপ বাঘের চোখের মত হিংস্র উত্তেজনা সে দৃষ্টিতে। শ্যামলীর চুলের মুঠির দিকে হাত বাড়ালে ইন্দ্রনাথ।

আর পরমুহূর্তেই বাতাস চিরে চিরে ভেঙে পড়লো একটা ভীতি-বিহ্বল নারীকণ্ঠের চীৎকার।

চমকে চোখ তুললে শ্যামলী। বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকালে দোতলার দিকে। ইন্দ্রনাথের চোখেও বিমূঢ় দৃষ্টি। অবোধ্য বিস্ময়ে এদিকে ওদিকে তাকালে ও।

শিউলির কণ্ঠস্বর। ওরা দুজনেই বুঝলো। দোতলার দিকে অনুবীক্ষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো। না, একটা ছায়াও দেখা গেল না।

শুধু সেদিনই নয়। প্রতিদিন।

ঠিক ঐ মুহূর্তটিতে। বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পায় ও। শিউলির চীৎকার। কান্নাভরা চীৎকার। কিন্তু কেন? কেন, কে জানে!

মায়া হয়। বেদনা বোধ করে ইন্দ্রনাথ। শিউলির জন্যে। আর সুরঞ্জনের ওপর ক্রোধ।

হঠাৎ মোড় ফিরে গেল ইন্দ্রনাথের জীবনের। বিকেলে আপিসের ছুটির পরই ফিরে আসে ইন্দ্রনাথ। সারা সন্ধ্যাটা শ্যামলীর সঙ্গে গল্প করে। টুকিটাকি সাহায্য করে শ্যামলীকে, তার কাজে। কাজ বাড়ায় তার চেয়ে বেশি। শ্যামলীকে টেনে বসায় নিজের কাছে। কখনো বা ওর হাত থেকে এটা ওটা কেড়ে নিয়ে চটিয়ে তোলে। শ্যামলী তবু খুশী। হঠাৎ যেন ওর মনে হয়, ও নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে।

রাত ঘন না হতেই দুজনে শুয়ে পড়ে খাওয়াদাওয়া সেরে। কিন্তু ঘুম নামে না শ্যামলীর চোখে। ও অপেক্ষা করে। প্রতিদিনই অপেক্ষা করে থাকে ও। যতক্ষণ না শিউলির চীৎকারটা শুনতে পায়।

তারপর। একটা দীর্ঘশ্বাস।

অন্ধকারেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্তনবাস আর অন্তরাবরণ খুলে রাখে শ্যামলী। তারপর হাল্কাভাবে একটা হাত রাখে ইন্দ্রনাথের পিঠের ওপর। তন্দ্রার ঘোর কাটে ইন্দ্রনাথের। আরো ঘনিষ্ঠ করে কাছে টেনে নেয়

ও শ্যামলীকে। খুশিয়াল একজোড়া সাপের মত আনন্দের আবেশে ডুবে যায় ওরা। শুধু কোথায় একটা মনের কোমল কোণে খোঁচা লাগে একটু। শিউলির চীৎকারটা বড় অসহায় করে তোলে শ্যামলীকে।

ঠিক ওদের সেই পুরোনো জীবনটাই যেন শিউলিকে ছুঁয়েছে। ঠিক ইন্দ্রনাথের মতই তো হাসিখুশি থাকে সুরঞ্জন। সারাটা দিন দেখে মনেই হবে না শিউলির জীবনে কোথাও কোনো খেদ আছে। কোন ছন্দপতন!

শ্যামলী মনে মনে মনে ঠিক করলে, সুরঞ্জনকে ও বাধা দেবে। অত্যাচার নিজে সহ্য করে এসেছে ও এতদিন। তাই জানে, ব্যথাটা কোথায়। ও আজ বাধা দেবেই সুরঞ্জনকে।

পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল শ্যামলী, নিঃশব্দে। তারপর শিউলির ঘরের দিকে পা বাড়ালে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তে চীৎকার করে উঠলো শিউলি।

ছুটে গিয়ে জানালায় উঁকি দিলো শ্যামলী। পরমুহূর্তেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ও। দেখলে খিলখিল করে হাসছে শিউলি।

হঠাৎ কানে গেল শ্যামলীর—সুরঞ্জন বলছে, কি ছেলেমানুষি করো!

শিউলি হেসে উত্তর দিলো, শ্যামলী তো সান্ত্বনা পায়।

[১৩৫৬]

তা লা ক

লোকে বলে গাঁ-ঘরে এমনটি দেখা যায় না। বড়ো ঘরের মেয়ে না হলে কি এমন রূপ হয়! কোরা ধুতির মত চাঁপা-চাঁপা রঙ, আঁটোসাঁটো চেহারা, মাথায় একটু খাটো হলে কি হবে, মুখ-চোখের গড়নে খুঁত নেই এতটুকু। বারো বছরের চাঁদবানু যখন নাকছাবির চুনী আর পায়ে রুপোর মল বাজিয়ে ঘুরে বেড়ায়, চোখে না দেখতে পেলেও মনটা কাণায় কাণায় ভরে ওঠে কাসেমের, শুধু মলের ঝুন-ঝুন ঝুন-ঝুন আওয়াজ শুনে।

রসুলগাঁয়ের মাথা হলো লতিফ সাহেব। এই লতিফ সাহেবের মেয়ে চাঁদবানু।

বাপের তিরিশ বিঘে জোতজমি, মিঠাসায়রের চার আনি অংশ, আর আছে মৌলানার ডাঙায় আম-খেজুরের বাগান। এমন ঘরের মেয়ে বলেই না অমন রূপ। ঘরের মেঝে যে বিলিতি মাটিতে বাঁধানো, পায়ে তো কাদা লাগে না। আর করোগেটের চালে চাঁদনীর আলো ঠিক্‌রে এসে মুখে পড়ে বলেই তো চাঁদের মত রূপ চাঁদবানুর।

লতিফ সাহেবের ছোটবিবিও দেখতে-শুনতে মন্দ ছিল না বয়সকালে। তারই তো মেয়ে, হবে না কেন পরীর মত দেখতে? তবে বয়েস কম হলো না, বারোয় পা দিয়েছে। গড়নে-বাড়নে চৌদ্দ বলেই মনে হয়।

তাই ছোট বিবি মাঝে মাঝে ধমক দেয়। বলে, বয়সটা কম হয় নাই তোর, বিয়াসাদি হলে ছেলের মা হতিস চাঁদি।

চাঁদবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, হোক্‌ বয়েস, তা বলে বুরখার ভিতর—দম্‌ বন্ধ হয়ে আসে আমার।

লতিফ সাহেব শুনে হাসে। বলে, তা চাঁদি ঠিকই বলছে, সদরের আবদুল সাহেবের মেয়েরা সব্বার চোখের সমুখ দিয়ে ইস্কুলে যায়, কাছারির মামলায় গিয়ে দেখে আসছি।

ছোট বিবি রেগে গিয়ে বলে, এটা সদর নয় তোমার, রসুলগাঁয়ের মাথা তুমি, ইজ্জতের কথাটা ভাবতে হয়।

লতিফ সাহেব বলে, রাখো তোমার ইজ্জতের কথাটা। মানুষ আছে নাকি রসুলগাঁয়ে যে, লাজশরম হবে চাঁদির।

কথাটা সত্যি।

মানুষ আছে নাকি রসুলগাঁয়ে। পঁচিশ ঘর মুসলমানের ছোট্ট গাঁ। জাতেই মুসলমান, আদব-কায়দায় নয়। গরীবের গাঁ, কেউ ডিঙিতে মাছ ধরে বেড়ায়, কেউ তাঁত বোনে। আর বেশির ভাগই লতিফ সাহেবের জমি চষে, ধান ভানে, আর নয়তো খেজুর রসে জ্বাল দিয়ে গুড় বানায়।

একটাই লোক আছে—বাচ্চা করিম। বাপ মারা গেছে, এখন পাটোয়ারী কারবারটা করিম নিজেই দেখে। আশ-পাশের গাঁ থেকে ঘি, ডিম আর গুড় কিনে চালান দেয় সদরের হাটে। পয়সা হয়েছে, তার প্রমাণ দু দুটো বিবি করিমের। নামটা কিন্তু সেই বাচ্চা করিমই রয়ে গেছে।

করিমের চেহারাটা কিন্তু বেশ ছিমছাম। পাকা দালান তুলবে বলে ইটের পাঁজা পোড়াচ্ছে সদর থেকে রাজমিস্ত্রী এনে। দু দুটো বিবি, দু-জনেরই গলায় রুপোর হাঁসুলি, মিনে-করা বাজুবন্দ। নক্সাকাটা ফুলবাহার শাড়ী বানায় তাঁতী-ঘরে বায়না দিয়ে। এ ঘরে চাঁদির বিয়ে দিলে মেয়েটা সুখী হবে, ভাবে ছোট বিবি। আর তাই চাঁদবানু যখন-তখন খিড়কি পার হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে গেলে রেগে যায় সে।

চাঁদবানু কিন্তু অত-শত বোঝে না, হাতে লণ্ঠন নিয়ে গোয়াল দেখে, খড়ের জাবনায় হাত ডুবিয়ে দেখে জল আছে কি না, তারপর গুনে গুনে মুর্গীগুলোকে ঝাঁপিতে ভরে।

একটা কম হলে চীৎকার করে ডাক দেয়। —অ কাসেম, মুর্গীগুলো গুনতি করে দেখো ফের, একটা খাটাশে ধরলো না তো!

আঠারো বছরের জোয়ান কাসেম তাতেই খুশী, চাঁদবানুর কাছ থেকে কাজ পেলে আর কিছু চায় না ও। মিঠা সায়রের পাড় খুঁজে খুঁজে মুর্গীটা ধরে আনে, মুখ-চোখের ভাব যেন, কত বড়ো একটা কাজ করেছে।

কিন্তু হাসে না কেন চাঁদবানু? কেন জিজ্ঞেস করে না, কোথায় পেলো কাসেম দলছুট মুর্গীটাকে, কাদায় কাদায় কত ঘুরতে হয়েছে তাকে, সামনে দিয়ে সরাৎ করে গোখরো গেছে কি না ফণা দুলিয়ে!

হোক্ কাজের কথা, কথা শুনতে পেলেই কাসেম খুশী। কথা বলতে পেলে হয়তো আরো খুশী হত। কিন্তু তেমন সুযোগ বড়ো একটা হয় না। সারাটা দিন ক্ষেতে লাঙল টেনে সন্ধ্যের সময় ফিরে আসে।

—এক ছিলিম তামুক দেবেন গোমস্তা সাহেব!

গোমস্তা সাহেব এ সময়টা এক গেলাস চায়ের লোভে পাটোয়ার বাচ্চা করিমের বাড়ীতে আড্ডা জমায় জেনেও, গোমস্তা সাহেবের নাম ধরেই ডাক দেয় কাসেম। বার দুই ডাক দিলেই বেরিয়ে আসে চাঁদবানু।

বলে, অ কাসেম, এই নাও তোমার তামাক।

আন্দাজে আন্দাজে অন্ধকারে হাতড়ে আঙিনাটার সামনে যায় কাসেম। দু-হাতের আঁজলা এগিয়ে দেয়। আর উঁচু আঙিনার ওপর থেকেই ওর হাতের ওপর তামাকটা ফেলে দেয় চাঁদবানু।

—একটু আঙার দিবে না?

চটে যায় চাঁদবানু।—কাজ-কামের চেয়ে তোমার ফরমাশটাই বেশি বেশি কাসেম! বলে দপ-দপ করে পা ফেলে চলে যায় উনোন থেকে আগুন আনতে।

ও তো বোঝে না আসলে কাসেমের ফরমাশটা কেন। মোট কথা চাঁদবানুর দিকে তাকিয়ে থাকতে, চাঁদবানুর হাঁটাচলা—সব—সব কিছুই যেন ভালো লাগে। আর ঘরে ফিরে ঘুম আসে না ওর চোখে। শুধু চাঁদবানু, চাঁদবানু। স্বপ্ন দেখে অনেক টাকা জমিয়েছে কাসেম। জমিজমা না থাক্, খেজুরের গাছ আছে বারোটা, খেজুরের গুড় আর পাটালি বানিয়ে সদরে বেচে এসেছে চড়া দরে। তারপর সেই টাকা নিয়ে শুরু করেছে করিম সাহেবের মত পাটোয়ার কারবার। করোগেটের ঘর হয়েছে, বিলিতী মাটি অর্থাৎ সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো হয়েছে ঘরের মেঝে।

তারপর?

তারপর লতিফ সাহেব যেন এসে বলছে, অ কাসেম, সবই তো হলো, জমিজমাও কিনলে, এবার বিয়াসাদি না করলে ঘর যে আঁধার সেই আঁধারই রয়ে যাবে।

কাসেম তখন বলবে, বিবি আনার মত মেয়ে কই লতিফ সাহেব, আপনিই কন্ দেখি?

—কেন, আমার চাঁদিকে তো ছোটকাল থেকে দেখছো তুমি।

সত্যি! তা যদি কোন দিন সম্ভব হয়। ভাঙা চালের খড়ের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখে কাসেম। মুখটা তো দেখতে পায় না অন্ধকারে, আর আলো থাকলেও তো নিজের মুখ নিজে দেখতে পাবে না, তবু কাসেম বুঝতে পারে, তার মুখে যেন হাসি লেগে রয়েছে।

নিজের মনেই কখনো হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ময়লা গামছাটার খুঁটে চোখ মোছে। জন খাটার নসীব যার, সে কি না স্বপ্ন দেখে চাঁদবানুকে

বিয়ে করার! বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে কাসেমের।

চাঁদবানু কিন্তু অত-শত বোঝে না। তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন কাসেমের ওপর দয়া হয় ওর। যেদিন বেগার দিতে আসে কাসেম, চাঁদবানু ডেকে কথা বলে।

কাজের শেষে কাসেমের হাতে তেল ঢেলে দেয়, বলে, ডুব দিয়ে এসো মিঠা সায়রে, তোমার ভাত হয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি একটা ডুব দিয়ে এসে মরাইয়ের পাশে এনামেলের থালা-ঘটি নিয়ে বসে পড়ে কাসেম। চাঁদবানু গরম ভাত ঢেলে দেয় থালায়, আর ডাল। তরি-তরকারিও থাকে কোন কোন দিন।

বসে বসে পেট ভরে খায় কাসেম, আর সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করে চাঁদবানু। বলে, অ কাসেম, বুড়া হতে চললে, বিয়াসাদি করবে না?

—বিয়াসাদি? হাসে কাসেম। বলে, আমাদের কে বিয়া করবে, নিজের পেটটাই কথা শোনে না।

বলে বটে, কিন্তু সন্দেহ যায় না। বিয়ের কথা কেন বলে চাঁদবানু? তবে কি কাসেমের স্বপ্নটা ওর মনেও উঁকি দেয়!

মনের ভেতর গুন্‌গুনুনি শুরু হয়। নিজের মনেই একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে করিম সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়।

হিসেবের খাতা দেখতে দেখতে চোখ তুলে তাকায় করিম সাহেব।—কি কাসেম, খবর আছে নাকি কিছু?

—একটা কিছু বাণিজ্য বাতলে দেন সাহেব। জন-মজুর খেটে তো পেট চলে না।

হো-হো করে হেসে ওঠে করিম সাহেব।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বছে, বাণিজ্য আছে একটা, করবে তুমি?

ঘাড় নাড়ে কাসেম।

করিম সাহেব মৃদু হেসে বলে, বিশটা টাকা পাবে নগদ, বিয়া করতে হবে।

—বিয়া? চোখ কপালে তোলে কাসেম।

করিম সাহেব হেসে বলে, এ বাণিজ্যটা খুব ভালো কাসেম। সদরের মহাজন বাবুমিঞা তার এক বিবিকে তালাক দিয়ে নিজের হাতে নিজেই কামড় দিচ্ছে এখন।

কাসেম তবু বুঝতে পারে না, তেমনি চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

করিম সাহেব ধীরে ধীরে বলে, আমাদের মুসলমানের ধর্মটা বড়ো

কড়া কাসেম! হিন্দুর ঘরের বৌকে বাপের বাড়ী তাড়িয়ে আবার ফিরে লওয়া যায়। আমাদের একবার তালাক দিলে সে বিবিকে ঘরে আনা যায় না।

কাসেম তবু কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

করিম সাহেব আবার বলে, হাঁ, সে বিবিকে অন্য কেউ বিয়া করে তালাক দিলে তবেই তালাক দেওয়া বিবিকে আবার বিয়া করা যায়, ফিরে আনা যায়, এটা আমাদের কানুন।

কাসেম বলে, হাঁ সাহেব, মুসলমান ঘরের কানুন মানতে হয়।

—তাই তো বলছি কাসেম। বাবু মিঞার বিবিটাকে তুমি বিয়া করে তালাক দাও, কুড়িটা টাকা পাবে, আর ঘরের বিবি তার ঘরে ফিরবে।

লাফিয়ে ওঠে কাসেম।—ছি ছি, এ কি কন সাহেব! গরীব মানুষের কি ইজ্জত নাই?

—ইজ্জত! হো-হো করে হেসে ওঠে করিম সাহেব। বলে, কুড়িটা টাকা পাবে ভেবে দেখো কাসেম।

ভেবে দেখেছে কাসেম, অনেক ভেবেছে। গরীব হলেও অমন ভাবে ইজ্জত নষ্ট করতে পারবে না সে। তার চেয়ে মাছ ধরার নাম করে নদীতে ডিঙি ভাসিয়ে চলে যাবে একদিন, ফিরবে না আর। তবু তো চাঁদবানু বলবে না, কাসেম তালাক বিক্রী করে।

কাজ করতে করতে কেবলই ভয় হয় কাসেমের। চাঁদবানুর কানেও পেঁছে যাবে না তো কথাটা! করিম সাহেব মিছে করে বলবে না তো, কাসেম রাজী হয়েছে!

এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই সাঁতার দিয়ে নদী পার হচ্ছিল কাসেম।

চাঁদবানু বলেছে, অ কাসেম, সদরে হাট বসেছে, আমার জন্যে চার গাছা রঙিন জলচুড়ি এনে দেবে?

কাসেম হেসে বলেছে, চুড়ি? তুমার জন্যে চাঁদ আনতে পারি, কও তো আনি। বলে কোমরে পয়সা গুঁজে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল কাসেম।

কিন্তু হঠাৎ কিসে যেন, বোধ হয় জলসাপে কাটলো কাসেমকে। তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠে এলো সে ডান হাতটার অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে।

চীৎকার শুনে কেউ কেউ ছুটে এলো। লতিফ সাহেব হেকিম আনালো মনিরপুর থেকে। কিন্তু যন্ত্রণা কমলো না।

হেকিম বললে, সদরের হাসপাতালে পাঠাতে হবে, কিসে কামড় দিয়েছে

বোঝা যাচ্ছে না।

মাস কয়েক পরে সদরের হাসপাতাল থেকে যখন ফিরে এলো কাসেম, গাঁয়ের লোক দেখে চমকে উঠলো। কনুইয়ের ওপর থেকে ডান হাতটা একেবারে কাটা।

হাসিটা কান্নার মত দেখালো কাসেমের। বললে, ডাক্তাররা বললেন, হাতটায় পচন ধরেছে কেটে বাদ দিতে হবে। তা বাদ দিয়ে দিলেন তাঁরা।

কিন্তু কাসেম তখনও বুঝি জানতো না, সত্যিই একখানা হাত কাটা গেছে তার। তার যে রঙিন মন হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরতে চাইতো, সেই হাতটাই কাটা গেছে।

লতিফ সাহেব বললে, একটা লোকের ভাত তো আর খরচ হবে না কাসেম, তুমি আমার বাড়ীতেই থাকবে। চাঁদি তো নেই কাসেম, আমার ঘরটা আঁধার করে চলে গেছে চাঁদি, বাচ্চা করিমের ঘর আলো করছে।

চলে গেছে চাঁদবানু? করিম সাহেবের ঘর আলো করতে চলে গেছে? ঝর-ঝর করে দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো কাসেমের। বাঁ হাতটা মাথায় রেখে বসে পড়লো সে।

লতিফ সাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করলে, কি হলো কাসেম?

—হয় নাই কিছু, বড়ো কাহিল লাগছে শরীরটা। উত্তর দিলো কাসেম।

পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে হন্-হন্ করে করিম সাহেবের বাড়ীর দিকে চলে গেল। কাটাখালের কাছে পেঁছে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইলো কাসেম।

রাতারাতি যেন ভোল পাল্টে গেছে বাড়ীটার। ক-টা মাস হাসপাতালে পড়েছিল কাসেম, আর তারই মধ্যে এত সব ঘটে গেল? চাঁদবানুর বিয়ে হয়ে গেল করিম সাহেবের সঙ্গে? তা হোক্, করিম সাহেব না হোক্ কোন উঁচু ঘরে যে বিয়ে হবে চাঁদবানুর তা সে জানতো। কিন্তু এমন উঁচু ঘরে?

দূর থেকে তাকিয়ে রইলো কাসেম। দেখলে, ইটের দেয়াল উঠছে, পাকা দালান হয়েছে করিম সাহেবের। দোতলায় একটা চিলে কোঠাও যেন হবে বলে মনে হলো। সামনের সারকুঁড়ের পাশের জমিটুকুন ভরে আছে পালং শাকে। আর সারের গাদায় চরে বেড়াচ্ছে অগুন্তি মুর্গী। গোয়ালে চার-চারটে গাই।

সত্যি, এমন বাড়ীতে যখন বিয়ে হয়েছে চাঁদবানুর, তখন সুখী হবে সে নিশ্চয়ই। তাই যেন হয়, মনে মনে কাসেম বললে, তাই যেন হয়। চাঁদবানুর জন্যে পীরের দরগায় মানত করে আসবে কাসেম। •

কিন্তু চাঁদবানুকে একটুক্ষণের জন্যে দেখে আসতে ইচ্ছে হয় তার। ইচ্ছে হয় আগের মতই গিয়ে তামাক চাইতে, দুটো কড়া কথা শুনে একমুখ হাসতে। অথচ তা বুঝি আর সম্ভব নয়। যে মেয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া ছুটে বেড়াতো, জলকাদায় নালাটা পার হবার সময় যার পায়ের গোছা চোখে পড়েছে কাসেমের কত বার, সে বোধ হয় এখন আর দেখাও দেবে না।

তবু করিম সাহেবের বারান্দায় গিয়ে হাজির হলো কাসেম। লতিফ সাহেবের গোমস্তা আর আরও জনকয়েক লোক বসে বসে মোসায়েবি করছে তখন।

কাসেমকে দেখে সবাই চমকে চোখ তুললে কপালে।—কাসেম ভাই যে! হাতখানা কি হলো ভাই কাসেম?—কে যেন প্রশ্ন করলে।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে কাসেম।—ডাক্তার কইলেন, হাতটার পচন ধরেছে, তাই.....

করিম সাহেবও দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর বললে, শোনো কাসেম, শোনো।

কাছে এগিয়ে গেল কাসেম।

করিম সাহেব বললে, আমি তো মাসের বিশটা দিনই সদরে থাকি, তা দালান তুললাম, ঘরটা দেখাশুনার তো লোক লাগবে। তুমি আমার কাছেই থাকো কাসেম!

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। সেইজন্যেই তো এসেছিলো করিম সাহেবের কাছে। মনের মধ্যে গুন্‌গুন্ করলো চাঁদবানু—চাঁদবানুর দেখা পায় না একবার? তা হলে দেখতে পেতো চাঁদবানুর চোখে জল টলমল করে কি না তার কাটা হাতখানা দেখে।

অনেকক্ষণ বসে রইলো কাসেম, তারপর তামাকের ছিলিমটা শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালো।—যাই করিম সাহেব, গাঁ ঘরগুলো দেখে আসি একবার।

আনমনে করিম সাহেবের বাড়ীর পর্দাঢাকা জানালাটার দিকে একবার চোরা-চোখে তাকিয়েই মাঠের পথ ধরছিলো কাসেম।

হঠাৎ মেয়েলী গলার ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো।

—অ কাসেম!

চাঁদবানুর গলা না? ফিরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকালো সে। দেখলে, খিড়কির দরজার পাশে বোরখায় মুখ ঢেকে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে এগিয়ে যেতেই মুখের পর্দাটা সরিয়ে ফেললো চাঁদবানু। তারপর কাসেমের কাটা হাতটার দিকে তাকিয়েই সশব্দে খিল-খিল করে হেসে উঠলো।

—অ কাসেম, হাতটা তোমার কোন্ বিবিকে দিয়ে এলে?

কাসেম চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর ফিস-ফিস করে বললে, যে হাতে তোমার ফরমাশ খাটছি সে-হাতে অন্য কারও ফরমাশ খাটবো না তাই...

খিল-খিল করে আবার হাসলো চাঁদবানু। তারপর বললে, এই বেলা এখানেই ভাত খাবে, গোসল করে এসো।

সারাটা গাঁ ঘুরে ঘুরে ফিরে এলো কাসেম। একটা কলার পাতা তুলে এনে ধানগোলার পাশে আগের মতই বসলো।

চাঁদবানু জল ঢেলে দিল ঘটিতে। গরম ভাত পড়লো পাতার ওপর। কি সুন্দর একটা গন্ধ নাকে এলো পাতার গরম ভাত পড়তেই। ভাতের ওপরেই ডাল ঢেলে দিলো চাঁদবানু। আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে। আহা, বেচারী—বাঁ হাতে খেতে কষ্ট হচ্ছে কাসেমের। ডালু গড়িয়ে পড়ছে পাতা থেকে। ভাতের আড়া দিতে পারছে না।

চোখ ছল্‌ছল্ করে উঠলো চাঁদবানুর।

ছুটে পালালো সে সেখান থেকে। এ দৃশ্য বুঝি দেখা যায় না।

কাসেম কিন্তু মাথা হেঁট করে খাচ্ছে তো খাচ্ছে। বুঝতে পারলো না চাঁদবানু কেন চলে গেল।

খাওয়া শেষ করেও যখন চাঁদবানুর দেখা মিললো না, তখন ঘটির জলটা ঢকঢক করে শেষ করে পাতাটা মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

করিম সাহেবের কাছেই তো কাজ পেয়েছে কাসেম, আজ না আসুক চাঁদবানু, আবার তো দেখা পাবে।

দেখা সত্যিই হত, কথাও। চাঁদবানু কাছে এলেই যেন কথা আর শেষ হতে চাইতো না কাসেমের। আর চাঁদবানুও যেন ঐ সময়টুকুর জন্যেই হাসতে, কথা বলতে উন্মুখ হয়ে উঠতো। দুজনেই বুঝতে পারতো না, ওদের হাবভাব দেখে করিম সাহেবের অন্য বিবিদের মধ্যে কি ফিসফিসানি চলে।

যেদিন সদরে চলে যেত করিম সাহেব, সেদিন বাড়ী পাহারা দেবার

জন্যে বাইরের বারান্দাটায় শ্যুতো কাসেম। আর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতো চাঁদবান্যু। বাপ-মায়ের খোঁজ-খবর নিতো। যত দুঃখের কথা বলতো কাসেমের কাছে। অন্য বিবিরা কত দুর্ব্যবহার করে তার সঙ্গে, কি গালাগালি দেয় বড়ো বিবির মেয়ে, একদিনের তরেও বাপের কাছে কেন যেতে দেয় না করিম সাহেব।

তাদের কথা কেউ শুনছে কি না, আর কেউ দেখছে কি না তাদের, সে হুঁশ থাকতো না কারও। আর থাকবেই বা কেন? চাঁদবানুর বাপের কাছে জন খাটতো কাসেম। তা কাসেমের কাছে সুখদুঃখের কথা বলবে না তো, মন হাল্কা করবে কার কাছে সে?

করিম সাহেব কিন্তু অত-শত বুঝলো না। চাঁদবানু নাকি কাসেমের কাছে আসতো রাত হলেই। বিবিরা নাকি নিজের চোখে দেখেছে সব।

রাগের মাথায় করিম সাহেব হাতের ছড়িটা বসিয়ে দিলে কাসেমের পিঠে। দুজন লোককে বললে, বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে কাসেমের পিঠে চাবুক বসাতে।

সমস্ত পিঠে কালশিটে দাগ নিয়ে লতিফ সাহেবের বাড়ীতে ফিরে এলো কাসেম।

লতিফ সাহেবকে দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। তারপর সব কথা খুলে বললে। বললে, চাঁদবানু কোন গুনা করে নাই সাহেব।

দোষ করুক বা না করুক, করিম সাহেব ভেবে দেখলো না। রাগের মাথায় মৌলবীকে সাক্ষী রেখে তালাক দিয়ে দিলো চাঁদবানুকে।

তালাক তালাক তালাক!

চাঁদবানু কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো বাপের কাছে। লতিফ সাহেবের ছোটবিবিও শুনে চোখ মুছলো আঁচলে।

গাঁয়ের মৌলবী বললে, তা তালাক দিয়েছে করিম সাহেব ভালই হয়েছে। মেয়ের তোমরা নিকা দাও সদরের কোন ভালো লোক দেখে। দু-বছর ঘর করছে করিমের, কোলে একটা বাচ্চাও দিতে পারে নি আহাম্মকটা।

লতিফ সাহেব উত্তর দিল, তালাকের ক-টা মাস যাক্, চাঁদির মন হয় তো সদরের আব্দুল উকিলের ছেলের সাথেই নিকা দেবো।

চাঁদবানু কিন্তু কিছুতেই রাজী হলো না। না হয়, বেওয়ার মতই থাকবে সে, তা বলে নিকা করবে না চাঁদবানু।

বাপ-মা বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু বুঝতে চাইল না সে।

কাসেমও ভয়ে ভয়ে বললে, আব্দুল উকিলের ছেলেটাকে দেখেছি আমি। বাপের মতই বুদ্ধি ছেলেটার, তিন-তিনটা পাশ দিয়েছে......

শুনে খিল-খিল করে হেসে উঠলো চাঁদবানু।

কাসেমও বুঝলো না, কি চায় মেয়েটা। এমনি বিধবার মত থাকবে নাকি চিরকাল? না কি, মনে মনে করিম সাহেবকেই ভালবাসে ও! তাই হবে হয়তো!

হঠাৎ একদিন করিম সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হলো কাসেম। বললে, চাঁদবানুকে ঘরে ফিরিয়ে আনো করিম সাহেব, ও গুনা করে নাই কিছু। কু-লোকের কথা শুনে তালাক দিলে মিছামিছি।

করিম সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ঠিক কথা কাসেম, কু-লোকের কথা শুনে তোকেও শাস্তি দিলাম, নিজের বুকটাও কাঁদে এখন। চাঁদবানু, তুই জানিস না কাসেম, বড় ভালো মেয়ে চাঁদবানু।

—তবে ফিরায়ে আনো না কেন?

করিম সাহেব হাসলে।—মুসলমান ঘরের কানুনটা বড়ো কড়া কানুন কাসেম, ইচ্ছা হইলেই তালাক দেওয়া বিবিকে ফিরায়ে আনা যায় না।

কাসেম বললে, মৌলবীকে বললে উপায় বাতলে দিবে।

করিম সাহেব ফিসফিস করে বললে, উপায় আছে কাসেম, তুই পারিস চাঁদিকে ফিরায়ে আনতে! তুই নিকা করে চাঁদিকে তালাক দে কাসেম। পঞ্চাশ টাকা দেবো তোরে, 'না' করিস না কাসেম ভাই!

মৌলবীও সেই কথাই বললে।—ঘরের বিবি ঘরে ফিরবে, তুই বাদ সাধিস না কাসেম। লতিফ সাহেবও রাজী হয়েছেন।

—আর চাঁদবানু? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে কাসেম।

মৌলবী বললে, চাঁদবানু যে নিকা করলো না সে তো ঐ করিমের তরেই। নিকা হয়ে ফের তালাক না হলে করিমের ঘরে আসতে পাবে না চাঁদি, এ-কথা মুসলমান ঘরের কানুন, তাই রাজী হয়েছে চাঁদি।

কাসেম বললে, তবে আমিও রাজী হইলাম, কিন্তু তালাক বিক্রীর টাকা দিবেন না আমারে।

টাকাটা তো বড়ো কথা নয়। চাঁদিকে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে কাসেম, তার দোষেই তালাক দিয়েছিল করিম সাহেব, ঘরের বিবি ঘরে ফিরবে, তার জন্যে টাকা নেবে কেন কাসেম।

চাঁদবানুকে সব কথা খুলে বললে লতিফ সাহেব। জিজ্ঞেস করলে

তোর মতটা ক চাঁদি! রাজী আছিস তো? লজ্জার হাসি হেসে মাথা নাড়লো চাঁদবানু। হাতকাটা কাসেমের সঙ্গেই নিকা হয়ে গেল চাঁদবানুর।

সত্যি এমন দিনটার জন্যে কত স্বপ্নই না দেখেছে কাসেম। কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে শুধু আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে। অথচ, সত্যিই যখন তার ঘরে এলো চাঁদবানু, কাসেমের মনটা হু-হু করে কেঁদে উঠলো। মনে হলো গাঁ-সুদ্ধ লোক যেন হাসছে তাকে দেখে। বলছে, কাসেম তালাক বিক্রী করেছে। কাসেমটা চশমখোর, টাকার লোভে তালাক বিক্রী করেছে করিম সাহেবকে!

চাঁদবানুর সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতেও সাহস হয় নি। চাঁদবানুও হয়তো হাসছে মনে মনে, কাসেমের নসীব দেখে।

নিজের মনেই নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল কাসেম। হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল তার। চমকে উঠলো কাসেম। পায়ের ওপর কি ওটা, বেড়াল নাকি?

উঁহু। পায়ের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে চাঁদবানু, আর চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে যেন কাসেমের পায়ের ওপর।

ধীরে ধীরে উঠে বসলো কাসেম।

ডাকলে, চাঁদি, অ চাঁদি।

সশব্দে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলো চাঁদবানু।

তাব মুখটা এক হাতে তুলে ধরবার চেষ্টা করলে কাসেম। বললে,

কি হলো চাঁদি, কাঁদছে কেন?

জলে-ভাসা এক জোড়া চোখ তুলে কাসেমের মুখের দিকে তাকালো চাঁদবানু। বললে, আমারে তালাক দিবে না কও!

দীর্ঘশ্বাস ফেললে কাসেম। বললে, না চাঁদবানু, দিব না তালাক, তালাক দিবো না তোমারে। বলে চাঁদবানুকে বুকের কাছে টেনে নিলো কাসেম। একটাই তো হাত, চাঁদবানু নিজেই যেন তার বুকের কাছে সরে এলো। কাসেম কাটা হাতটা রাখলো চাঁদবানুর মাথায়। বললে, কিন্তু নিমকহারাম কইবে সকলে, তুমার আব্বাজানের কাছেও নিমকহারাম হইতে কয়ো না চাঁদি।

বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকালে চাঁদবানু। অবোধ্য ঠেকলো যেন কাসেমের কথাগুলো! ও কি কোন দিন বোঝে নি কাসেমের গোপন স্বপ্ন, না কি ও নিজেই স্বপ্ন দেখে নি!

তবু কাসেম বললে, পাটোয়ারের বিবি হবার রূপ তুমার, আমার ভাঙ্গা

ঘরে কি চাঁদরে ধরা যায়। তালাক আমারে দিতেই হবে, তুমার ভালোর জন্যেই দিতে হবে চাঁদি।

তালাক, তালাক, তালাক।

তা হোক্, গলার হার গলায় পরে খুলে দিয়েছে কাসেম। সেই স্বপ্ন তো সবচেয়ে মিঠে, কি হবে তাকে তার দেয়ালের বাক্সে ভরে রেখে।

[১৩৬২]

অভিসার রঙ্গনটী

নতুন বাসা। আর আর সকলের সঙ্গে তমালও এসে উঠলো নতুন বাসায়। যখন পোঁছলো ওরা তখন বিকেলের আলো নেই, আছে বাতাস। বিকেলি বাতাস। আধ-কপাটে মুখ লুকোনো মেয়ের মত সন্ধ্যে তখনও আঙুলে আঙুল ভাঁজছে। আলোর গালে ধোঁয়াটে বিষণ্ণতা, অথচ রোদের তাপ বাতাসের গায়ে।

লরী থেকে নামালো কেদারা কুর্সি, খাট আলমারি। সামনের বারান্দায় স্তূপাকার করে মালপত্রগুলো নামিয়ে দিয়ে লরী দুটো সরে পড়লো। জিনিসপত্তর গোছগাছের দিকে মন দিলো সবাই। ভাড়াটে কুলীদের হৈ-হল্লা, চাকরবাকরদের খবরদারি, ঠুকঠাক ধুপধাপ আওয়াজ।

সবাই ব্যস্ত। নিশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই যেন। কোমরে কাপড় জড়িয়ে বেণী দোলাতে দোলাতে এঘর ওঘর শুরু করলো কাঞ্চনা। বুলু, মণ্টু, তিমির—ওরাও হুমকি দেয়, হুকুম দেয়।

দায় দায়িত্ব নেই শুধু তমালের। কাজ চাপালেও খসে পড়ে, হাঁস-পালকের জলের মত। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো তমাল। কাজ যা করছে তা ঐ ভাড়াটে কুলীর দল। বাচ্চাগুলো হয় এটা ফেলছে, নয় ওটা ভাঙছে। কেউ বা শুধু ধমক দিচ্ছে। না, তমালের কোন প্রয়োজন নেই এখানে।

সিঁড়ির আলোটা জেবলে ওপরে উঠে এলো ও। একেবারে দোতলার বারান্দায়।

ইতিমধ্যে অন্ধকার আরো খানিকটা জমেছে, বাতাসে আকাশের ছায়া। বারান্দার রেলিং ছুঁয়ে দাঁড়ালো তমাল। তাকালো। শিশিরে মুখ মুছলো বুঝি, রজনীগন্ধার বনে নিশ্বাস টানলো! আপনা থেকেই কেমন মনটা খুশী হয়ে ওঠে। রোমে রোমাঞ্চ জাগে।

কিন্তু আরো কি যেন খুঁজেছে তমাল। আরো কি যেন চায়।

অবাঙালীর দেশে অর্ধেক যৌবন কাটিয়ে এই প্রথম এসেছে ও বাংলার শহরে। এই মহানগরকে ঘিরে কত জাগর-স্বপ্ন উঁকি মেরে গেছে ওর মনের

কাপে। সারাটা পথ কল্পনার ডানা উড়িয়েছে। রাত-কাঁপানো ট্রেনের তালে তালে কত না ঘুমন্ত কামনার শীষ দুলে উঠেছিল। সে শীষ বুঝি শুকিয়ে যায়।

চমকে উঠলো তমাল। না, নিজেরই দীর্ঘশ্বাস। হতাশা। হতাশ্বাস। সমস্ত দেহ আর মন দৃষ্টির হাত বাড়িয়ে কিসের যেন স্পর্শ চায়।

মুখ। একটি সুন্দর মুখ।

কিন্তু এ পৃথিবীতে বুঝি বা মানুষ নেই। মুখ নেই মন হারাবার মত, চোখ নেই চিত্তচঞ্চল করা। শুধু ধূসর-অন্ধকার, আর দলছুট-জোনাকির মত এখানে ওখানে দু-চার টুকরো আলোর ফুলকি। গুঁড়ো-গুঁড়ো মেঘ-মেশানো ফিকে জ্যোৎস্নার রেশ, ছায়া-ছায়া আবছা আলো।

এপাশে ওপাশে বাড়ীর সারি। নিশ্চুপ নির্জন। নতুন বাসিন্দে এল পাড়ায়, অথচ একজনও অনুসন্ধানে উন্মুখ নয়। কে এলো, কোত্থেকে এলো, কেন এসেছে—এসব প্রশ্নে মুখর হয়ে কোন হাসি-হাসি মুখ দেখা দিলো না। উঁকি মারলো না কোন চপল চোখের চাউনি। শুধু এপাশের বাড়ীর শার্সির ওপাশে এক টুকরো হলদে আলো। আর সামনে পথের ওপারে শুধু অন্ধকার। মাঠ বোধ হয়। কিংবা কে জানে পার্কও হতে পারে। রেলিং দিয়ে ঘেরা যখন। হ্যাঁ, রেলিং—দূর-দূর মিঠে আলোয় এটুকু অন্তত বোঝা যায়।

পার্কই। আর পার্কের গা ঘেঁষে একটা উঁচু ঢিবির সুদীর্ঘ রেখা। সটান চলে গেছে পূব পশ্চিমে। এক সারি ক্ষুদে পাহাড়ের মাথা ছেঁটে যেন নামানো হয়েছে এক সমতলে। তা নয় অবশ্য। আসলে ওটা একটা রেলপথ। মাটি থেকে গজ পনেরো ওপরে ওই লম্বা আর উঁচু মেটে রাস্তা বেয়ে চকচক করছে একজোড়া রেল লাইন।

বাড়ীটার পশ্চিমে, পার্কটার পশ্চিমে, বেশ খানিকটা দূরেই একটা চওড়া রাস্তা। উত্তর আর দক্ষিণ, দু-মুখে ছুটেছে। প্রচুর আলো। গ্যাসলাইট, বিদ্যুৎ. নিওন, ফ্লুরোসেণ্ট। জনতার জঞ্জালও। দু-একটা কথা-কৌতুকও ভেসে আসে, চাপা আলাপের শব্দ। চকিতে ছুটে যায় ট্রাম আর বাস। ঘুঙুরের মত ট্রামের ঘণ্টি বাজে কখনো, কখনো বা নিঃশব্দে পিছলে পড়াব ফিসফিসানি। হুস্‌স্‌। একটানা দীর্ঘনিশ্বাসের মত।

দেড় সেকেণ্ডের ছুটকো টানেলের মত একটা সুড়ঙ্গপথ রেললাইনের নীচে—রেললাইনের উঁচু ঢিবিকে ভেদ করে গেছে। তারই ভেতর দিয়ে ট্রামের যাওয়া-আসা। দূর থেকে, বিশেষ করে ফিকে জ্যোৎস্নার রাতে,

রহস্যময় সাঁকোর মত দেখায়।

সেই দিকেই তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিল তমাল। হঠাৎ সশব্দ হাসির ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো। অদ্ভুত হীরেঝরা হাসি, ধারালো হাসি। চমকে চোখ ফেরালো তমাল। পাশের বাড়ীর সেই হলদে আলোর জানালায় একটি সুন্দর মুখ। হাসি উছলে পড়া একটি মেয়েলীমুখ। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তমালের দিকে। অবোধ্য চোখের তারায় কোন এক কামনা-সফল কৌতুক। রহস্যময়। তমালের সমস্ত শরীরে যেন রোমাঞ্চের শিহরণ বয়ে গেল। উন্মাদ? কে জানে!

বন্ধু জুটলো দিন কয়েকের মধ্যেই। আর তারাই জানালো তমালকে। নতুন খবর। কিন্তু তমাল যা জানতে চায় তার সন্ধান ওরা কেউই জানে না।

তমাল একটু আশ্চর্য হলো।—এদ্দিন এপাড়ায় বাস করছেন, অথচ ও বাড়ীর সঙ্গে আলাপ নেই আপনার?

সহাস্যে উত্তর এলো, কে কার তোয়াক্কা রাখে এখানে। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত সবাই। তাছাড়া, পাড়ার সকলকে এড়িয়ে চলতে চায় ওরা। মেলামেশা পছন্দ করে না হয়তো।

তমালের প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যায়। ক-জন মানুষ ও বাড়ীতে? কারা থাকে? পুরুষের সংখ্যা কত? নারীর? কি করে, কোথায় যায়, এমন এক অবোধ্য রহস্যের জালেই বা ঘিরে রেখেছে কেন বাড়ীটাকে!

মানুষ? অনেক। অনেক মুখই তো দেখা যায়। চেনা আর অচেনা। ঐশ্বর্যের আওতায় জড়ানো প্রতিটি পদক্ষেপ। দু-খানা গাড়ী, বুইক আর হিল্‌ম্যান। মোটর ছাড়া যেন চলে না, হাঁটতে দেখা যায় নি এক পা। চোখাচোখি হলেও কথা বলে না।

অদ্ভুত। কি যেন এক রহস্য আছে বাড়ীটায়, তমালের বিশ্বাস।

ওরা হাসে।—রহস্য ও বাড়ীতে নয়, রহস্য আপনাদের বাড়ীটায়।

তমালও না হেসে পারে না। বলে, শুনেছি সে-কথা। ভুতুড়ে বাড়ী, এই তো? কিন্তু কয়েকদিন তো কাটলো, দেখতে পেলাম না একজন মহাপ্রভুকেও।

হ্যাঁ, একথা অনেকে অনেকবার বলেছে ওদের, কিন্তু বিশ্বাস করে নি কেউ! বাড়ীআলার সঙ্গে পাড়াপড়শীর বিরোধ থাকলে বাড়ীটার ভুতুড়ে

হতে সময় লাগে না। এ খবর ওদের জানা।

তাই, তমাল বিরক্তি চেপে বললে, প্রমাণ আছে কিছু?

—প্রমাণ কি ভূতেরা রেখে যায়?

তমাল হেসে হাল্কা করার চেষ্টা করে ব্যাপারটা, জিজ্ঞেস করে, বিশেষত্ব আছে নিশ্চয় কিছু একটা?

আছেই তো। এক বছরের মধ্যে তিনটি ভাড়াটে পরিবার পালিয়েছে এ বাড়ী ছেড়ে।

—ব্যস্, এই? তমাল রীতিমত একটা গল্প শুনতে না পেয়ে হতাশ হয়।

উত্তর আসে, না, এই শেষ নয়। প্রত্যেকটি পরিবারের একজন করে পাগল হয়ে গেছে এ বাড়ীতে আসার পর। আপনারই বয়সের একজন পুরুষ।

—পুরুষ? হেসে উঠলো তমাল। বললে, কোন পেত্নিটেত্নীর কাণ্ড তা হলে। তবে, একথা মানছি যে, যত রকমের ভূতের কথা শুনেছি তার মধ্যে এইটেই সব চেয়ে অদ্ভুত।

হেসে উড়িয়ে দিয়ে এলো তমাল, হেসে হারিয়ে দিয়েছে সব তর্ক। তবু, সংস্কারমুক্ত মন তো নয়, তাই ভুলতে পারে নি একেবারে। হঠাৎ কখনো-সখনো হয়তো মনে পড়েছে ওদের সাবধানী, আর অমনি, বিস্ময়ে উদাস হয়েছে ওর মন।

সেদিনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একথাই ভাবছিল ও।

সবে সকাল হয়েছে তখন। সুমুখের নীচের রাস্তায় হোসপাইপের ফুলঝুরি। দুটো গরু হাঁকাতে হাঁকাতে গয়লাটা গিয়ে ঢুকলো পাশের বাড়ীর পাঁচিলের ভেতর, হাতের বালতিতে একটা কাঠি বাজাতে বাজাতে।

হঠাৎ চোখ তুলে তাকালো তমাল। ও-বাড়ীর দোতলার জানালায়। চোখে চোখ পড়লো, মৃদু মিষ্টি একটা হাসি ফুটে উঠলো মেয়েটির মুখে।

সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। আঙুলে আঙুল জড়ানো হাত দুটো পিঠের পিছনে টান-টান হয়ে বেঁকে রইলো, মিনিট কয়েকের জন্যে। ঘুম-ভাঙা মুখে, ঘামে-ভেজা মুখে ভোর-আবেশের শৈথিল্য বুঝি বা। শরীরের জড়তা ভাঙলো যেন, সমস্ত দেহে নূপুরের ছন্দ বাজিয়ে। মুজ্‌রা শুরু হবার আগে এ যেন নৃত্যনটীর পায়ে কাঁপা কাঁকনের ঝঙ্কার। যৌবনের কুঁড়িতে লোভানির পাপড়ি ফুটে ওঠা। নিদ্রামলিন সাদা

শাড়ীর আড়ালে লঘু কোমলতা।

স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে ছিল তমাল তন্ময় হয়ে।

আর এক টুকরো মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল মেয়েটি।

তমাল চোখ সরাতে পারলো না তবু। তাকিয়ে রইলো ও। অধীর অপেক্ষায়। আসবে, ও আবার আসবে এই আশায়।

পনেরো মিনিটও হয়তো কাটে নি। সেই মিষ্টি মুখ, সেই সুন্দর মুখের ওপর চোখ পড়লো তমালের। ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সে। সারা অঙ্গ ঘিরে বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছে লাল রেশমের শাড়ী। সুস্পষ্ট আগুনের শিখার মত। কিন্তু বড়ো অন্যমনস্ক দেখায় ওকে, চঞ্চল চোখ জোড়া অন্য কোন আকর্ষণে নিবদ্ধ যেন।

অপেক্ষা, অপেক্ষা।

ধীরে ধীরে ওর দৃষ্টিটা চারিদিক ঘুরে এসে পড়লো তমালের মুখের ওপর। সন্তুষ্টির হাসি হাসলে তমাল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির চাবুক কষিয়ে দিয়ে সরে গেল মেয়েটি।

লজ্জিত বোধ করলো তমাল। আহত বোধ করলো।

কিন্তু পাঁচটা মিনিটও হয়তো কাটে নি, বিমূঢ় বিস্ময় নামলো তমালের চোখে। হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে আসছিল তমাল, তবু শেষবারের মত আশার দৃষ্টিতে তাকালো ও, ছাদের দিকে, জানালার দিকে। অদ্ভুত। ছাদে নয়! দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি। লাল রেশমের আগুন নয়, সাদা শাড়ীর নির্মল মাধুর্য তার দেহে। ঠিক তেমনি মোহময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সে, তমালের চোখে চোখ রেখে।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে হেসে ফেললো তমাল। না, যমজ বোনেদের মধ্যেও এতখানি সাদৃশ্য দেখে নি ও কখনও। যমজ কি ওরা দুজন? কে জানে! কিন্তু কি আশ্চর্য মিল, দেহের কোথাও যেন এতটুকু ভিন্নতার রেখা নেই। মুখে নেই একটা কালো তিলের চিহ্নভেদ।

শুধু দেখে আর দেখা দিয়ে শুরু হলো পূর্বরাগ। সব সুস্থ মনের, সবল মনের অন্তরঙ্গ অভিভাব যেমন করে শুরু হয়, ঠিক সেই পথে, সেই একই পথে। একজনের চোখের তারা আরেক জনের চপল নীলায় আখর আঁকে, ছবি ফোটায়। স্বপ্ন বোনে, রঙ ছড়ায়। পরস্পরের বোবা চোখ কথা কয়। চলে মন দেয়া-নেয়ার পর্ব। পালা ফুরোয় না তবু।

কিন্তু বড়ো অস্বস্তি, বড়ো অধৈর্য হয়ে ওঠে তমাল। মন চায়, মেয়েটির কাছে যেতে, ছোঁয়া পেতে, অফুরন্ত কথা, কথা, কথার তরঙ্গে

নিজেকে ভাসিয়ে দিতে। কান পেতে শুনতে চায় ও অনর্গল মিঠে শব্দের কাকলি। সমুদ্রের ফেনার মত নরম আর স্নিগ্ধ কথা, অপ্রয়োজনীয় শব্দের সারি, আলাপী আন্তরিকতার রিমঝিম।

—কিন্তু উপায় তো নেই। কি করা যায় বল্ তো? তমাল প্রশ্ন করেছিল ওর কলেজের এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে।

সে সাহস জাগিয়ে দিলো।—আলাপ করলেই তো পারিস।

—ভয় করে যে! হেসেছিল তমাল।—কার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে কাকে ডেকে ফেলবো ঠিক কি? এদ্দিন ধরে দেখছি, তবু চিনতে পারি না দুজনকে।

বন্ধুটি হাসলো।

তমাল বললে, হাসছিস তুই। কি বিভ্রাটে পড়েছি তা যদি জানতিস! হয়তো সবুজ শাড়ী দেখে ভাবলাম ইনি নন, অতএব একেবারে অন্যমনস্কের মত চোখ ফেরালাম পার্কের দিকে, যেন দেখতেই পাই নি ওঁকে—ব্যস্ তিন দিন আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। অভিমান।

বন্ধুর উত্তর এলো, দুজনের দিকে সমান দৃষ্টি দিলেই তো হয়।

তমাল হেসে ফেললে, হুঁ। দ্বিতীয়টির চোখ তো দেখিস নি, যেন আগুনের ফুলকি্। পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়েছো কি মনে হবে নেমে এলো বুঝি ঘুঁষি বাগিয়ে।

সত্যি। এমনি এক দ্বিধাদ্বন্দ্বেব মধ্যে কাটছিল ওর দিনগুলো। কখনো কটাক্ষের ধমক, কখনো অভিমান, আর বাকী সময়টা হাসিখুশি, অর্থভরা চাউনি আর কামনার ইঙ্গিত।

এইভাবে চলছিলো ইতিহাস। তবু কাহিনী জমছিলো না।

ভুল আর ভুল। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে তমালের। কত ঘুমভাঙা রাত অসহ্য মনে হয়েছে। সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরেছে, বাসনাতুর দেহের অধীরতা সারা অঙ্গ কাঁপিয়ে তুলেছে।

এ কি রহস্য? এ কি অবোধ্য বিস্ময়? এক বছরেব মধ্যে তিনজন পুরুষ নাকি পাগল হয়ে গেছে এ বাড়ীতে। হঠাৎ কোন এক নির্জন রাতে মনে পড়েছে তমালের। অস্থির হয়ে উঠেছে ও। আশ্চর্য। তমালও কি পাগল হয়ে যাবে নাকি?

সমস্ত দেহের উষ্ণ রক্ত যেন ওর মগজে চক্র কাটতে শুরু করে। মদো রক্তের উদ্দামতায় ছটফট করে তমাল। ইচ্ছে হয়, ছুটে যায় ওর কাছে, ঐ মেয়েটির কাছে। কথা বলে। অনুরোধের আশ্লেষে ওকে জড়িয়ে

ধরে বলে, একটা চিহ্ন দাও, অভিজ্ঞান দাও তোমার দেহের, তোমার মুখের একটি বিভেদ চিহ্ন দেখিয়ে দাও। একটি ছোট্ট কালো তিল, একটা সামান্য কাটা দাগ। ছুরির আঘাতে এমন একটা চিহ্ন কি ও নিজেই সৃষ্টি করতে পারে না?

কিংবা, একটা ছুরির আঘাতে সব রহস্যের সীমারেখা টানা যায় না?

না, মনকে সংযত করবে ও।

একটা হপ্তা মেয়েটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এলো তমাল। একবারও এসে দাঁড়ালো না নির্দিষ্ট বারান্দায়, তাকালো না চোখ মেলে। কেন মিছে এই বৃথা ব্যর্থতা ডেকে আনবে। তার চেয়ে পার্কের হিমেল ঘাসের সবুজে গা ডুবিয়ে নিশ্চিন্তে নক্ষত্র গোনা অনেক আরামের।

তাই বাতাসের গায়ে রোদের তাপ কমতেই বেরিয়ে এলো তমাল। এসে বসলো সামনের পার্কে একটা ন্যাড়া গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে। অদূরে ঝিলটার জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দু-এক দমক ঠাণ্ডা বাতাস এলো। আকাশে তারা ফুটলো, চাঁদ উঠলো। ভরা জোছনার চাঁদ।

এমন চমৎকার নির্জনতা। এমন শান্ত একাকীত্ব।

চুপচাপ বসে রইলো তমাল। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখ গেল ওর—নেশায় পাওয়া সেই বাড়ীটার দিকে। আর পরক্ষণেই চমকে উঠলো ও। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলো না।

চোখে চোখ হয়ত পড়ে নি। ছায়া-ছায়া অন্ধকারে স্পষ্ট বুঝতে পারলো না তমাল। কিন্তু মেয়েটি যেন স্থির চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। আধ-খোলা লোহার ফটকে একটা হাত রেখে। কি দেখছে ও? কি ভাবছে অমন অচঞ্চল দৃষ্টিতে তমালকে লক্ষ্য করে। আসছে। মেয়েটি এগিয়ে আসছে। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো তমালের। বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্ন-সাফল্যের আশায়, না দুর্বল আবেগে? নির্জীবের মত বসে রইলো তমাল। উৎকণ্ঠায়, উন্মুখ আগ্রহে। কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসছে ও। ফিকে আলোর আড়ালে শুধু এক মেয়েলী শরীরের ছায়ামূর্তি। তন্বীদেহের লীলাচপল গতি। সিলুয়েটের ছবির মত ঝাপসা।

অপেক্ষা, অপেক্ষা। চোখ সরাতে পারে না তমাল। বড়ো অসহায়, বড়ো বেশী নিস্তেজ মনে হয় নিজেকে।

ওর ছড়ানো পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো ছায়াশরীরটা। লাফিয়ে উঠে পড়লো তমাল। হঠাৎ কোত্থেকে যেন এক মুঠো সাহস এসে জুটলো ওর

হাতের মুঠোয়।

—এসেছো, এসেছো তুমি? আমি ভীষণ ভীতু, তাই এগিয়ে যেতে পারি নি এতদিন।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললো তমাল। এতদিনের জমা হওয়া উচ্ছ্বাসের রাশ যেন এক মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে গেল। ব্যাকুল আবেগে মেয়েটির হাত দুটো জড়িয়ে ধরবার জন্যে এগিয়ে গেল তমাল।

কিন্তু তড়িৎস্পৃষ্টের মত পিছিয়ে গেল মেয়েটি। পর মুহূর্তেই খিলখিল করে হেসে উঠলো।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে হাত গুটিয়ে নিলো তমাল। লজ্জায়, আশঙ্কায়।

আবার ঠোঁট টিপে হাসলো মেয়েটি।—রাঙাদি এই চিঠিটা দিলো।

বুঝলো কি বুঝলো না, তমাল হাত বাড়িয়ে নিলো চিঠিখানা।

—কাল ঠিক এই সময় আসবো। উত্তর দেবেন। বলেই তর্‌তর্‌ করে দ্রুত পায়ে চলে গেল মেয়েটি। ছায়াশরীর ছায়ায় মিলিয়ে গেল।

চোখ থেকে চিঠিতে নামলো। আকর্ষণ থেকে অনুরাগ। রহস্যের কপাট খোলা যায় না তবু। মধুকন্যা কৃষ্ণা আর দয়িতাদূতী কাবেরী। দুই বোন। যমজই হয়তো ওরা। কিন্তু সামান্যতম কোন পার্থক্য যদি থাকতো। কে জানে, হয়তো বা আছে। নিকট আলাপে হয়তো সে চিহ্ন ধরা পড়বে। হয়তো কাবেরী বলতে পারে। কিন্তু প্রেমের গভীরে পৌঁছে এ-প্রশ্ন করা যায় না।

কৌতুকের ছলে একদিন বলেছিল তমাল, তুমি আর তোমার রাঙাদি কিন্তু একেবারে একরকম দেখতে, একটু তফাত নেই।

কাবেরী হেসে উঠেছিল।—আপনার চোখেও?

তমাল লজ্জিত হয়ে বলেছিল, না, দূর থেকে মনে হয়। কাছে এলে নিশ্চয় চিনতে পারবো, কে কৃষ্ণা কে কাবেরী।

কাবেরী হেসে উঠেছিল খিলখিল করে।—অর্থাৎ চিঠির আলাপ আর ভালো লাগছে না, এই তো? ভয় নেই, কালই দেখা হবে আপনাদের।

—কখন? আসবে, কৃষ্ণা আসবে কাল? উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে তমাল।

ঠোঁট টিপে টিপে হাসে কাবেরী।—হ্যাঁ—আসবে। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর, ন-টার সময়। ঐ বেঞ্চটায় থাকবেন। সামনের বেঞ্চটা দেখিয়ে দেয় কাবেরী।

সেই বেঞ্চটাতেই এসে বসলো তমাল! পরের দিন। ন-টা বাজতে তখনও হয়তো কিছু দেরি আছে।

কৃষ্ণা আর কাবেরী। মনে মনে ভাবছিল তমাল। একক অপেক্ষায় বসে বসে।

পাড়াপড়শীদের কথাটা মনে পড়লো হঠাৎ। এক বছরের মধ্যে তিনটি পুরুষ পাগল হয়ে গেছে এ-বাড়ীতে। রহস্যময় বাড়ী এটা। তাই কি! তমালও পাগল হয়ে যাবে নাকি? সত্যি মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘুমছাড়া রাতের নিঃশব্দতায় কখনো কখনো ভয় পেয়েছে তমাল। ওর মাথার ভেতর কি এক চাবি-হারানো রহস্য। ভালবাসি, অথচ ভাল-বাসার পাত্রীকে চিনতে পারি না। তবে কি ওর ভালবাসায় মিথ্যের খাদ আছে? কেন এমন হয়?

একটা ধারালো ছুরির আঘাতে কৃষ্ণার কপালে যদি একটা কাটাদাগের চিহ্ন আঁকা যেত।

হঠাৎ তন্ময়তা ঘুচে গেল তমালের। দূরের বাড়ীটার লোহার ফটকে কৃষ্ণাকে দেখা গেল। আলো থেকে অন্ধকারে নেমে এলো কৃষ্ণা। ছায়া-শরীরের অস্পষ্ট আভাস। এগিয়ে আসছে ক্রমশ। লজ্জায় যেন মাথা নুয়ে পড়েছে। চোখ লুকোনোর ব্যাকুলতা।

পার্কের ঘাসে পা ভিজিয়ে আরো কয়েকজন মেয়েপুরুষ পায়চারি করছে তখনও। ভেসে আসছে দু-চার টুকরো ভাঙা ভাঙা শব্দ। সহসা-থামা মিষ্টি হাসির রেশ।

আনন্দ আর খুশীতে দুলে উঠলো তমাল। তবু কেমন যেন এক অস্বস্তি। এমনি এক লজ্জা আর শরমে কৃষ্ণার গতিও হয়তো লঘু হয়ে গেছে। এত ধীরে ধীরে আসছে কেন ও?

কৃষ্ণা আসবে, সামনে এসে দাঁড়াবে। চোখ চাইবে, বলবে কথা। হয়তো, হয়তো পাশে বসবে ওর, দুজনে দুজনের অন্তরঙ্গ স্পর্শ পাবে।

কিন্তু, কি বলবে তমাল। কেমন করে বলবে! কত বিভোর ভোর, কত না লুকোনো বিকেলি বাতাসকে করে তুলেছে মুখর। কত ফিকে জ্যোৎস্নার রাতে বোবা চোখ হঠাৎ কথা পেয়েছে খুঁজে, না-বলা কথার জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণা। ঘন তিমিরের ছায়াবরণে শরীর লুকিয়ে এগিয়ে এলো কৃষ্ণা। দাঁড়ালো। একেবারে তমালের সামনে। পায়ের নখে চোখ এঁটে।

বেঞ্চের একপাশে সরে গেল তমাল। মুখে কথা যোগালো না।

চোখের সেই অনুচ্চারিত কথার অনর্গল স্রোত কোথায় গেল? দিনের পর দিন চিঠির দৌত্যে যে প্রগল্‌ভতার উচ্ছ্বাস বইয়ে এসেছে, কোথায় চাপা পড়লো তার রেশ?

বেশ কয়েক সেকেন্ড বোবা হয়ে থেকে অস্ফুটে শুধু বললে, বসো।

বসে পড়লো ও।

হয়তো মুচকি হাসলো। চোখ তুলে অপাঙ্গে তাকালো তমালের দিকে।

—কৃষ্ণা। গাঢ় স্বরে ডাকলে তমাল।—এতদিন কেন আড়ালে আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলে বলো?

মৃদু হাসি চেপে চকিতে চোখ তুলে তাকালো ও, তমালের দিকে। উত্তর দিলে না।

—কথা বলো কৃষ্ণা, কথা বলো। আবেগের কণ্ঠে তমাল বলে উঠলো। মুঠোর মধ্যে ওর একটা হাত চেপে ধরে বললে, লজ্জা কিসের, এখনো লজ্জা তোমার?

না, তমালের সব কথাটুকু হয়তো শেষ হয় নি। তার আগেই সশব্দে হেসে গড়িয়ে পড়লো কাবেরী। হেসে ঢলে পড়তে পড়তে বললে, লজ্জা আপনারই হওয়া উচিত। সুর করে করে ব্যঙ্গের স্বরে বললে, এত চোখ চাওয়াচাওয়ি চিঠি লেখালেখি, অথচ মানুষ চিনতে পারেন না, ভালোমানুষ পেয়ে রাঙাদিকে খুব ঠকাচ্ছেন আপনি, ওকে এতটুকুও ভালোবাসেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে তমাল।

কাবেরী হেসে প্রশ্ন করলে, কি হলো?

—সত্যি কাবেরী, তোমরা দুজনে সত্যিই আমাকে পাগল করে দেবে।

—উহুঁ। পাগল হতে হবে না। চলুন, রাঙাদি বাড়ীতে অপেক্ষা করছে; আপনাকে নিয়ে যেতে বললে। এত লাজুক, কিছুতে আসতে রাজী হলো না।

তমাল একটু বিস্মিত হলো।—বাড়ীতে?

—ভয় নেই, সব সিনেমা দেখতে গেছে ন-টার শোয়ে। হেসে উঠলো কাবেরী।

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো তমাল।—চলো।

চলতে চলতে কাবেরী বললে, সামনাসামনি দেখা হওয়ার পরও যদি চিনতে না পারেন তা হলে কিন্তু রাঙাদি বলেছে এইখানেই ইতি।

তমাল কোন কথা বললে না। কাবেরীর পিছনে পিছনে এসে ঢুকলো

ওদের বাড়ীর ভেতর।

পাঁচ ধাপ উঁচুতে বাড়ীটার প্লিন্‌থ। পাঁচ ধাপ সিঁড়ি ভাঙার পর মার্বেলের লম্বা করিডর। করিডরটা আবছা অন্ধকারে ঢাকা। রহস্যময় মনে হয়। গা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে তমালের। প্রায়ান্ধকার করিডরের দু-পাশে সারি সারি ঘর। ঘর নয়, কপাটের সারি। আর অন্যপ্রান্তে দূরে সুমুখে নীল আলোর ক্ষীণাভা। একটা ভারী পর্দা ঝুলছে দরজায়। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে শুক্লাতিথির সমুদ্রের মত নীলাভ আলোর ছায়া।

সমস্ত বাড়ীটা নিশ্চুপ। নিঃশব্দ। এতটুকু আওয়াজের লেশ নেই কোথাও। যেন জনমানবহীন কোন পরিত্যক্ত প্রাসাদের রোমাঞ্চ চেপে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যেন রূপকথার কোন নিদ্রিত পুরীতে আচমকা এসে উপস্থিত হয়েছে তমাল। বরফের দেশের মত শব্দহীন নিস্পন্দ!

পৃথিবীও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

সমস্ত বাড়ীটার অসহ্য নীরবতাকে ব্যঙ্গ করে দু-জোড়া জুতোর শব্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সামনের নীল আলোকের ঘর অবধি। পর্দার সামনে গিয়ে থামলো দুজনে।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো কাবেরী। বললে, আসুন।

পা থেকে চপ্পল খসিয়ে রেখে তমালও ঘরে ঢুকলো। বুকের মধ্যে অসহ্য এক স্পন্দন। হৃৎপিণ্ডের আওয়াজটাও যেন কানে আসছে ওর। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। ভয় আর আশঙ্কায়। আনন্দে উত্তেজনায়।

ঘরে ঢুকে চোখ চেয়ে তাকালে সমাল। নির্জন। দেয়ালের গায়ে একটা বিরাট প্যেণ্টিং। বলদৃপ্ত চেহারার একজন পুরুষ, সামরিক পোশাকে বিভূষিত। হাতে তলোয়ার, চোখের তারা যেন জীবন্ত রঙিন, আর নরম কার্পেটে ঢাকা মেঝের ওপর মাত্র তিন টুকরো সোফার কুশন। পাশের জানালায় পিতলের ভাসে কয়েক গোছা তারা ফুলের রাশ।

কাবেরী ধীরে ধীরে বললে, বসুন তমালদা। তারপর সেখানে থেকেই চাপা স্বরে ডাকলে, রাঙাদি, রাঙাদি।

কোন জবাব এলো না।

কাবেরী নিজের মনেই যেন বললে, যা লাজুক। যাই দেখি. পাঠিয়ে দিই। আপনি একটু বসুন।

কাবেরী চলে গেল।

একটু পরেই তমাল শুনতে পেলো কাবেরী বলছে, যা তমালদা বসে আছে। লজ্জা কি, যা না।

বেশ একটু কৌতুক বোধ করলে তমাল। সাহস পেলে। কৃষ্ণা যে ওর চেয়েও বেশি লজ্জিত হয়ে পড়েছে তা জেনে অনেকখানি অস্বস্তি কেটে গেল।

চুপচাপ বসে রইলো তমাল। হয়তো দু-মিনিট, হয়তো তিন মিনিট। অধৈর্য হয়ে উঠলো ও। বসে থাকতে পারলো না। কৃষ্ণা এখনো আসছে না কেন? কাবেরীই বা কি করছে? পাশের ঘরেই তো ছিল ওরা। জানালাটা খোলা রয়েছে, উঁকি মেরে দেখবে নাকি? দেখলেই বা। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল তমাল। উঁকি মেরে দেখলে।

—বাব্বা বিয়ের কনেটি সাজা হয়েছে! যা রাঙাদি, তমালদা কখন এসেছে বল তো?

—যাচ্ছি বাপু যাচ্ছি। তুই কিন্তু উঁকি দিস্ না, তোর চেয়ে এক ঘণ্টার বড়ো আমি, মনে থাকে যেন।

শুনতে পেলো তমাল। দেখলো যা কিছু দেখবার, আর সঙ্গে সঙ্গে সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হলো ওর। হো হো করে হেসে ওঠার ভয়ে এক রকম ছুটে বেরিয়ে এলো ও। ছুটে বেরিয়ে এলো একেবারে রাস্তায় করিডর পার হয়ে, লোহার ফটক পার হয়ে।

তারপর, পরের দিন।

প্রতিদিনকার মত পার্কের পা ছড়িয়ে ঘাসে বসেছিল তমাল। ন্যাড়া অর্জুন গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে। আর গত রাত্রের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হাসছিল।

সন্ধ্যে ঘন হয়ে এসেছে তখন বেশ খানিকটা।

হঠাৎ চোখ পড়লো তমালের সেই সামনের ছায়া-শরীরটার দিকে। সেই বহু পরিচিত ছায়া-মূর্তিটা এগিয়ে আসছে।

উঠে দাঁড়িয়েই পিছন ফিরে হাটতে শুরু করলে তমাল।

—তমালদা! তমালদা! ডাক শুনতে পেলো তমাল, তবু পিছনে তাকাল না। লঘু পায়ের ভিজে ঘাস আর শুকনো পাতা মাড়ানোর আওয়াজ এলো। ছুটে আসছে হয়তো।

—তমালদা! কাঁধের উপর একটা নরম হাতের স্পর্শ।

ফিরে তাকাতে হলো।

—কাল না বলে পালিয়ে এলেন যে! রাঙাদি ভীষণ চটে গেছে

কিন্তু।

তমাল বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো।—কি বলছেন? ভুল করেছেন, আমি তো… ..

—বাঃ রে, বেশ অভিনয় করতে পারেন তো তমালদা! হেসে হেসে বললে ও।

তমাল তখনও বিস্মিত। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না ও! তারপর বললে, তমাল? ও রাঙাদার কথা বলছেন? রাঙাদা তো বাড়ীতে আছে।

চমকে চোখ তুললে কাবেরী! পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলো বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। কিছুক্ষণ। তারপর, তারপর দুজনেই সশব্দে হেসে উঠলো। পরস্পর পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার সহজ আর সরল হাসি।

হাতে হাত জড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল দুজনে। কাছেব চাঁদ-ভাঙা কালো জলের ঝিলটার দিকে।

[১৩৫৬]

আতসী উজ্জ্বল

শহর দক্ষিণের এ অংশটা যুদ্ধের সময় ছিলো মার্কিনদের মিলিটারি হাসপাতাল। তারপর সেই সাজসরঞ্জাম, বাড়িবাগান জুড়ে দেশী রুগীদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা হলো। গড়ে উঠলো একটা নতুন ডাক্তারি কলেজ। আর হাসপাতাল।

দোতলা বিরাট প্রাসাদের মত বাড়িখানা এলো সরমাদের জিম্মায়। এক একখানা ঘরে দু দুজন নার্স। সারা ম্যানশনটায় কম করে পঞ্চাশজন সেবিকার আবাস।

মানসী বয়সে ওর চেয়ে বেশি বড় না হলেও বেতনে এবং বিদ্যায় নিশ্চয়। গা-ছোঁয়া হাসপাতালটার মেট্রন ও। তাই আর-আর সিস্টারদের মনের কোণে ওর প্রতি যেটুকু ভালবাসা আছে তা ভেজালে মেশানো। সরমা কিন্তু সত্যি বেশ আপন হয়ে উঠেছে মানসীর। অন্তরঙ্গ। তাই দখিন-খোলা মাঝের সেরা ঘরখানাই হয়েছে মানসী আর সরমার কুমারীকুঠি।

ছোট্ট ঘর। দু-দিকের দেয়াল ঘেঁষে দুখানা একক পালঙ্ক। একটা কম-দামী ড্রেসিং টেবিল। চিঠি লেখবার একখানা ক্ষুদে মেজ, সবুজ রং করা। আর খান দুই তেপায়া। সারা ঘরটায় ঐশ্বর্যের ছাপ নেই কোথাও। দারিদ্র্যের আছে হয়তো।. তবু কত পবিচ্ছন্ন। পরিপাটি। বাফ্ রঙের ডিসটেম্পর করা দেওয়ালের গায়ে কোন এক নাম-করা ওষুধ কোম্পানীর ক্যালেন্ডার।

সহজ কথায় সরমা আজ সুখী।

খাওয়া-পরার খরচ চালিয়েও বেশ কিছু টাকা হাতে থাকে ওর। কিন্তু সব টাকাই মা-কে পাঠাতে পারে না। ইচ্ছে হয় বৈকি। ছোট্ট বোন আর ছোট ভাই দুটি। তিনজনেই ইস্কুলে পড়ছে। মার অসুখ আর পুজো-পার্বণও যেন অঙ্গাগী ভাবে জড়িয়ে আছে। যে ক-টা টাকা পাঠায় ও, চারজনের পক্ষে তা কতটুকু! ইস্কুলের মাইনে, বই কেনার টাকা। ওষুধের দাম, মা কালীর মানত। আরো কিছু যদি পাঠাতে পারতো!

ব্যয়ের অঙ্ক ও অনেকখানি সংক্ষেপ করেছে, রুচির হানি ঘটিয়েও। এ বোর্ডিঙের আর পাঁচজনের মত দু-জোড়া জুতো অবধি রাখে নি। কাঞ্চন-শাড়ীর সঙ্গেও ঐ সাদা জুতোটাই চালিয়ে দেয়। প্রসাধনের পায়ে প্রণামী দেয় না, সিনেমা দেখে ক্বচিৎ কখনো।

ফুরসত পায় ছুটির দিনে। ফুর্তির ফোয়ারায় গা ডুবিয়ে দেয় সেদিনটা। সারা সকালটা হৈ-চৈ করে। এর ওর ঘরে ঢোকে, কারো বাক্সপ্যাঁটরা খোলে, কারো বা চিঠিতে চোখ আঁটে। এ দরজায় টোকা দেয়, ও দরজার ফাঁকে ছুঁয়ে দেয় দু-এক কলি ভাঙা গানের সুর, কাউকে টিটকারি দেয়, কাউকে সহানুভূতি।

সারা দুপুর এদিকে দল বেঁধে রাস্তায় টোঁ-টোঁ। নিউ মার্কেটের ফলের দোকান, হোয়াইটঅ্যাওয়ের শো-কেস। সিনেমার স্থির ছবির উইনডো, ওদিকে হকার্স-কর্নার। দশ-বারোজন মিলে এখানে-ওখানে জবরদস্তি দেখাবার চেষ্টা করে। বাসট্রামের সামনে হাত তুলে দাঁড়ায়, চাপা দাও নয়তো থামো। ব্লাউজের ছিটের দর কষাকষি করে, হিন্দিতে ধমক দেয়। তারপর ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে।

আর-আর দিনগুলো একঘেয়ে। একঘেয়ে হলেও বিরক্তির নয়। সারা দিনের খাটুনিতে যা কিছু শ্রমাতুর ভাব তা সান্ধ্যরোমাঞ্চের বাতাস ওর কপাল থেকে মুছে নেয়।

বিকেলের মেঘের রক্ত যখন জমে কালো হয়ে যায়, হলুদ-রঙা বাতাসের তাপ কমে, তখন স্নানান্তের স্নিগ্ধসৌরভ মেখে সামনের বারান্দায় এসে বসে সরমা। এদিকে আকাশের প্রথম তারারা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। সাড়া না দিয়ে পারে না ও।

সারিবাঁধা কৃষ্ণচূড়ার পাতা নড়ে ওঠে। সন্ধ্যার সুগন্ধি বাসিবাতাসকে টেনে নিয়ে যায়। আর নরম ঘাসের বীথিপথের ওপর হাল্কা পায়ে পায়চারি শুরু করে সরমা। এক একবার আচমকা মাথা তোলে, চোখের দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় অনেক অনেক অন্ধকারের দূরত্বে। আবছা আলোর ফিকে রোশনাই আর আরো দূরের জমাট অন্ধকার। এভেন্যুর দু-পাশে ল্যাম্পপোস্টের সারি। প্রহরী-আলোর আমেজটুকুও দূরে গিয়ে দিক হারিয়েছে। ফিকে হয়ে গেছে জনতার ভিড়। তবু এগিয়ে যায় সরমা। তারপরই হঠাৎ হয়তো চোখে পড়ে একটি ছায়াপুরুষ। প্রতীক্ষাসফল আনন্দের হাসি উছলে ওঠে ওর চোখের নীলায়।

অমানিশার অন্ধকারই থাক বা শুক্লজ্যোৎস্নার জোয়ারই জাগুক আকাশে,

নিরালা পৃথিবীর মাঝে, বন-কৃষ্ণচূড়ার আঁধারের চাঁদোয়ায় ঢাকা নিরালোক পৃথিবীর মাঝে এসে নামে ওরা। পাশাপাশি। একটি নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে এসে বসে ওরা দুজনে।

রাত গভীর হয়ে আসে। আর মন। তারপর, একসময় যতি পড়ে ওদের মুগ্ধমনের কথালাপে। একক শূন্যতার মাঝে ফিরে আসে সরমা। কুমারী-পালঙ্কের নরম শয্যায় শরীর ছড়িয়ে রেখে চোখের পাতায় ঘুম নামাবার মন্ত্র পড়ে।

ওদিকের রোগা খাটে মানসী।

তন্দ্রাবেশে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সরমা। তবু ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে বলতে হয়, ওর দৈনন্দিন রোমাঞ্চের ইতিহাস শোনাতে হয় মানসীকে। নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ হয়ে আসে সারা দুনিয়া। শব্দহীন। শুধু ওদের দুজনের টুকরো টুকরো হাল্কা কথা। কাচের গেলাসে গুঁড়ো বরফের কুচির মত ঠাণ্ডা, ভাঙা ভাঙা।

মানসীর কাছে কিছু লুকোতে চায় না সরমা। লুকোতে পারে না। বুক উজাড় করে অদ্ভুত একটা আনন্দ পায় ও। ভরসাও।

কিন্তু—হ্যাঁ, মানসীর কাছ থেকেও একটা দিনের কাহিনী গোপন রেখেছে সরমা। শুধু একটি দিন।

বিকেল পাঁচটার ঘণ্টা পড়লো। আর অন্যান্য দিনের মতই সেদিনও কি এক অবোধ্য অস্বস্তি এসে ঢুকলো সরমার বুকে।

রোজই এমন হয়।

লম্বা ওয়ার্ড। দু-পাশে সারি-বাঁধা রোগশয্যা। মাঝখানে সরু একটা প্যাসেজ। সমস্ত ঘরখানায় একটা পরিচ্ছন্নতার প্রলেপ। শান্ত আর নিঃশব্দ। প্রতিটি লোহার খাটে শ্বেতশুভ্রতার বিছানা বিছানো। আর রুগীদের শিয়রের কাছে টাঙানো এক একটি গ্রাফ-আঁকা চার্ট। হাসপাতালের সুদীর্ঘ ওয়ার্ড—এ দরজা থেকে ওদিকের ফটক অবধি যেতে পাঁচ মিনিট অন্তত লাগবে। অথচ সারাটা দিন সরমা অক্লান্ত।

কপালে ওর ঘাম ফোটে, মুখে হয়তো বা শ্রমোজ্জ্বল রক্তিমাভা। কিন্তু চোখে শ্রান্তির আবেশ দেখা দেয় না। রুগীরা কেউ সহজ, কেউ বা আড়চোখে লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করে। হাসপাতাল ছেড়ে যাবার বহুদিন পরেও হয়তো ওদের মনের পটে ভেসে ওঠে এখানকার দৃশ্যটুকু।

সরমা। নাতিশীর্ণ দেহ জড়িয়ে যার একখানি সাদা ফুটফুটে শাড়ী, পায়ে সাদা জুতো মাথায় কালোকেশের কোমল প্রাচুর্য ঢেকে শুশ্রূষকের শ্বেতচিহ্ন। সবে মিলে অদ্ভুত সুন্দর দেখায় ওকে। জীবন্ত যৌবন। একটি ভ্রমরাকাঙ্ক্ষী রজনীগন্ধার অন্ধ কলির মত। উদ্দাম আর চঞ্চল। উন্মাদনা আর চপলতা। হ্যাঁ। খুটখুট করে ফ্ল্যাট-হিল্ জুতোর হাল্কা আওয়াজ চেপে চেপে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সারাটা দিন। তখনই থার্মোমিটার দিচ্ছে এর জিভের নিচে, জ্বরতরঙ্গের গ্রাফ আঁকছে চার্টের গায়ে। আর তখনই হয়তো ওর ঠোঁটের কাছে ধরেছে ওষুধের গ্লাস। দুটো হাল্কা হাসি এর দিকে, ওকে দুটো সান্ত্বনা, আরেকজনকে হয়তো বা তর্জনী-তোলা ধমক।

সত্যি। সারাটা দিন ও অক্লান্ত। কিন্তু পাঁচটার ঘণ্টা শুনতে পেলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে ও। ছুটির ডাক শুনতে পায়, দিনান্তের রোদো বাতাস ওর মদো রক্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করে।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখা যায়। হাসপাতালের দক্ষিণের দেয়াল ছুঁয়ে গেছে চওড়া সড়ক। দু-পাশে একপথো পীচের রাস্তা, মাঝখানে ঘাসের জমিন। আর পথ বড় হলেও এদিকটায় গাড়ীঘোড়ার উৎপাত নেই। বেশ ঠাণ্ডা, চুপচাপ। পোড়া পেট্রোলের গন্ধ আসে না নাকে, হর্নের হঠকারিতা নেই।

পাঁচটার ঘণ্টা ওদিকে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের পৃথিবী থেকে ছিটকে এলো খানিকটা চঞ্চল বাতাস। সান্ধ্যভ্রমণাদের ভিড়-ভিড় গুঞ্জন কানে এলো সরমার।

আর একটি ঘণ্টা। তারপরই ছুটি।

হঠাৎ ঘরের আলো কাঁপলো। ভাঙলো নিঃশব্দতা। কারও কণ্ঠে উচ্চকিত স্বর, কারও চোখে বিষণ্ণ হাসি। টুকরো টুকরো কথার কাকলীতে ঘর কেঁপে উঠলো।

হ্যাঁ। প্রতিদিনই, ঠিক এই সময়টায় রুগীদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা এসে হাজির হয়। দৈনন্দিন সাক্ষাতের জন্যে।

আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার বার ওর চোখ যায় একশো বাষট্টি নম্বর বেডের দিকে। খাটের পাশের টুলটিতে এসে বসে সে। রোগশয্যায় শায়িত বন্ধুকে সাক্ষাতের সান্ত্বনা দিতেই আসে। কিন্তু, চোখ থাকে তার সরমার দিকে। প্রথম প্রথম কৌতুক বোধ করতো সরমা। নিজেরই অজান্তে ঠোঁটের কোণে ওর হাসি দুলে উঠতো, তারপর সচেতন হতেই

ঠোঁট টিপে হাসি চাপতো।

এমন অদিন্ন হত না সত্যি, কিন্তু হাসিটা মধুর। তাই হয়তো অন্য কোন অর্থ পেয়েছিল লোকটি, ভুল ভেবেছিল। ফলে সাহস বেড়ে গেল তার। যা ছিল মোমবাতির আলোর মত ঠান্ডা মোহময় দৃষ্টি, আশার আগুনে তা জ্বলে উঠলো।

অসহ্য লাগলো সরমার। অস্বস্তি বোধ করলো ও। মানসীর কাছে অনুযোগ করলো। উত্তর এলো বিদ্রূপের হাসি। শুশ্রূষকের জীবন বেছে নিলে এমন অনেক কিছুই নাকি সয়ে যেতে হয়।

সরমা প্রতিবাদ করলে, তা বলে অমন বিশ্রীভাবে তাকিয়ে থাকবে কেন?

মানসী হাসলে।—ও তো শুধু তাকিয়েই থাকে।

সরমা মনে-মনে চটে। বেশ। ও নিজেই এর ব্যবস্থা করবে।

সেদিন কিছু একটা বলবে বলেই লোকটির দিকে এগিয়ে গেল সরমা। ভর্ৎসনার স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

—শুনুন।

না। সরমা নয়। ও কিছু বলবার আগেই লোকটিই ডেকে বসলো। সরমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে, কথা জুটলো না ওর মুখে।

দু-খানা দশ টাকার নোট ধরলে লোকটি ওর চোখের সামনে।—এ'র জন্যে কিছু ফলমূল আনাবার ব্যবস্থা করে দেবেন? এই টাকা কটা—

রুগীদের জন্যে ফলমূলের ব্যবস্থা নেই। টাকার বিনিময়ে সে ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সাধারণত সেটা করে হাসপাতালের জমাদার বেয়ারার দল। দু-পাঁচ টাকা বখশিশের লোভে। তা বলে, সরমাকে? তবু হয়তো ক্ষমা করতো ও, কিন্তু লোকটির সুবোধ্য হাসি আর টাকার পরিমাণ—এ দুটো মিলিয়ে কি এক অর্থ পেল সরমা। রাগে রী রী করে উঠলো সারা শরীর।

মানসীকে বললে এরপরও লোকটার আসা বন্ধ করবে না?

মানসী হাসলে।—এত সহজ ভাবিস?

—তবে ডিউটি বদলে দাও আমার। অন্য ওয়ার্ডে দাও।

উত্তর এলো, বোকা মেয়ে!

গোলাপী টার্কিশ টাওয়েলটা ওড়নার মত বুকে কাঁধে জড়িয়ে হাতে সাবানের কৌটোটা তুলে নিয়ে সান্ধ্যস্নানের জন্যে পা বাড়াচ্ছিল সরমা। পেছন থেকে ওর আঁচলটা টেনে ধরলো মানসী।

—এত তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিস কোথায় শুনি?

সরমা মৃদু হেসে বললে, বেশ যা হোক্। দিলে তো যাত্রাটা মাটি করে। গিয়ে দেখবো বাথরুমে পাম্পের জল নেই।

—খানার বচন পড়িস নি? আগে হতে পিছে ভালো যদি ডাকে মা-য়।

—দিদি, মা নও। বয়সটা একটু বেশি হলে নয়—

—উঁহু, তা হলে কি আর তোর প্রেমের গল্প শুনতে পেতাম।

—দেখো মানুদি, গল্প-গল্প বলো না বলছি।

—ওঃ চটেই লাল হয়ে আছেন মেয়ে। মান অভিমান দেখাতে হয় তার কাছে দেখিও। গম্ভীরভাবে বললে মানসী। পরক্ষণে হেসে ফেললে।—চুপ করে বসে আগে তোর উপাখ্যানটা বলে যা।

—বাঃ! কাল রাতে তো বললাম।

—উঁহু। দ্বিতীয় প্রেমিকটির কথা। ঐ হাসপাতালের ভদ্রলোক।

—ভদ্রলোক! কথাটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে সরমা। —লোকটার কথা ভাবতেও আমার গা ঘিন-ঘিন করে।

—তবে, প্রথম প্রেমিকের কথাই বল্।

সরমা হাসলে, কি বলতে বাকী রেখেছি?

সত্যি। কিছুই বাকী নেই। এর আগে কতবার যে বলেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে, ঘুমন্ত তো নয়। জাগর প্রেম। দিনে দিনে ঘটে নতুন সংযোজনা। আরো কথা। আরো কামনা।

ব্যাপার হলো এই যে, সঞ্জীব আর সরমা দুজনে মন-দেয়া-নেয়া করেছে।

আত্মীয়স্বজন নয়, পাড়াপড়শী নয় এরা কেউ। অতএব সে-খবরে মানসীর এত উৎসাহ কেন? কেন কে জানে। তবে ঔৎসুক্য মানুদির চেয়ে কারও কম বলে তো মনে হয় না। আজ আর সঞ্জীব-সরমা উপাখ্যান কারও অজানা নয়। সরমার ডাক-নাম যে 'ঠাণ্ডা' তা যেমন জানতে বাকী নেই কারও।

একজনই দিয়েছে এ নাম, আর একজনেরই ডাকবার কথা এ নাম ধরে। কিন্তু মানুদির জ্বালায় কি কিছু গোপন রাখবার জো আছে। দু-মাসও হয় নি ও এ বোর্ডিংটায় এসেছে। অথচ ইতিমধ্যেই এমন অবস্থা যে তিনজন এক জায়গায় হয়েছে কি দুজনের কথা—সঞ্জীব আর সরমা।

দোষই বা কি! ছ-টার ছুটি হতে না হতে এসে ঢুকবে ও স্নানের

ঘরে। তারপর মানসীর পাউডারের কৌটোটা টেনে নিয়ে পাফ্‌টা দু-গালে বুলিয়ে নেবে। চুলটা আঁচড়ে, শাড়ী ব্লাউজ ঠিক করে নেবে চটপট। তারপর এক পীস পাঁউরুটি আর এক কাপ ঠাণ্ডা চা। বোর্ডিংয়ের নেপালী ঝি গৌরীমায়া-চায়ের পেয়ালাপিরিচ সরিয়ে নিয়ে যাবার আগেই সরমা রাস্তায় নেমে পড়েছে।

এ যেন নেশার ডাক, নিশীথের ডাক।

ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বেঁটে টুলটায় বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল সরমা। আর গুনগুন করে গাইছিল কি-একটা গানের কলি। স্নানের পর বেশবাস বদলাতে, প্রসাধন-সাধনে এত সময় কোনদিনই দেয় না সরমা।

তাই মানসী জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার, ডিউটি দিতে যাবি না বুঝি?

সরমার এই সন্ধ্যের অভিসারকে 'ডিউটি' বলে ঠাট্টা করে সবাই। শুনে শুনে অভ্যেস হয়ে গেছে সরমার। বললে, না।

—কেন? অভিমান না অনিচ্ছা?

সরমা হাসলে।—আসবে না আজ।

তারপর চট করে উঠে এসে মানসীর খোঁপাটা ঠিক করে দিতে দিতে বললে, চলো মানুদি। ঘুরে আসি।

কিন্তু না। মানসী এ ব্যতিক্রমে রাজী নয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই দেয়ালঘেরা ঘরের বন্ধ বাতাসে কাটিয়ে দিয়েছে, এই বিজলী বাতির চোখধাঁধানো তিমিরের গভীরতায়। খোলা আকাশ, খোলা বাতাস সহ্য করতে পারে না ও।

অগত্যা একাই বেরিয়ে পড়লো সরমা।

দু-ধারে ল্যাম্পপোস্টের কনভয়। মাঝখানে নরম ঘাসের জনপদ। সবুজ নয়, অন্ধকারে কালো দেখায়। যেন একটা সুস্থযৌবন সাঁওতাল পুরুষের গলায় মুক্তোর মালা।

লঘুপায়ে হাঁটতে শুরু করে সরমা। কৃষ্ণচূড়া আর আমলকী, হিজল আর হরিতকী গাছের আড়ালে ঢাকা আধা-চাঁদের ছায়ার দিকে।

রাস্তার এ পাশে ফ্লোরেসেণ্ট আলোয়-ঝলমল একটা পানের দোকান। উঁচু হাসি আর তীক্ষ্ণ তর্কের বুলি কানে আসতেই ফিরে তাকালো সরমা। চকিত চোখে।

সে একশো বাষট্টি নম্বর বেডের পাশের একজোড়া চোখ। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

চোখাচোখি হলো। তারপর, তারপর আরেকবার ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হলো সরমার। তবু পারলো না। যেমন হেঁটে চলেছিল, হেঁটে চললো। পায়ের গতি হয়তো বা একটু দ্রুত হলো। কে জানে!

জনহীন ঘনবনের নিঃশব্দতায়, পথের পাশের ল্যাম্পপোস্টগুলো যেখান থেকে ফিরে এসেছে, তারও ওপারের অন্ধকারে ডুব দিয়ে হাঁপ ছাড়লো সরমা।

নির্জন। নির্জন আর অন্ধকার।

প্রতিদিনের মতই সেই নির্দিষ্ট বেঞ্চিটাতে এসে বসলো সরমা। একা। কি একটা রাতপাখী পাখা ঝটপট করে উড়ে গেল।

নিশ্চুপ বসে রইলো সরমা। আপন চিন্তার গভীরতায় ডুবে রইলো।

হঠাৎ।

কাছের গাছের আড়ালে চোখ গেল। একটা ছায়াশরীর। মুখ দেখা যায় না। শুধু সাদা পরিচ্ছদটা চোখে ভাসে। একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ হলো। সিগারেট ধরালো কে যেন, দু-হাতের তালুতে আগুনের শিখাটা আড়াল করে। কিন্তু, ঐ সামান্য আলোতেই চিনতে পারলে ও।

ভয়ে আশঙ্কায় উঠে দাঁড়ালো সরমা। তারপর দ্রুত পায়ে বোর্ডিংয়ের পথ ধরলে। পিছনের উচ্চকিত হাসির শব্দ কানে এসে পৌঁছলো। ধাক্কা দিলো বুকের ভেতর।

মানসী প্রশ্ন করলে, কি, এত তাড়াতাড়ি ফিরলি যে?

সরমা হাসবার চেষ্টা করে বললে, এমনি।

পরে অবশ্য সেদিনের কথাটা মানসীকে বলেছিল সরমা। আর দুজনেই প্রচুর হেসেছে। সরমা নিজেই বিস্মিত হলো ভেবে, এত ভয় করবার মত কি ছিল? মানসী বললে, গেঁয়ো! এখনও শহুরে হলি না তুই। এখানে আসবার টিকিট দিয়েছিল কে তোকে? সরমা হেসে বললে, কেন, স্টেশনের টিকিটঘরেই তো কিনেছিলাম। মানসী বললে, সেই তো সুবিধে হয়েছে তোদের। এখানে আসবার যোগ্যতা আছে কিনা তা তো দেখে না, পয়সা দিলেই ট্রেনে চড়তে পাওয়া যায়।

সঞ্জীবও হেসেছে হো হো করে—ভারি ভীতু তো তুমি! তাই বুঝি আসো নি এ দু-দিন?

ঠোঁটে হাসি টিপে রেখে মাথা নীচু করেছে সরমা। আঙুলে শাড়ীর পাড়টা জড়াতে জড়াতে বলেছে, না, ভয় করবে না! একা একা এই অন্ধকারে......

—এখন আর ভয় করছে না তো?

—হ্যাঁ, করছে। একা একা ভালো লাগে তোমার?

সঞ্জীব হাসলে।

সরমা বললে, হাসছো তুমি। কথা বলবার একটা লোক পর্যন্ত নেই।

—সে কি, অত লোক তোমাদের বোর্ডিংয়ে। মানুদি রয়েছেন!

—কথা ঘুরিও না।

—এতদিন তো সবুর করলে। আর কয়েকটা দিন সবুর করো।

—কেন?

সঞ্জীব চুপ করে রইলো।

অনুযোগ করলে সরমা, উত্তর না পেয়ে।—তোমার কাছে আমি একটা কথাও লুকিয়ে রাখি না, অথচ তুমি......

কথা খুঁজে না পেয়ে সঞ্জীব পকেট থেকে নতুন কেনা ফাউণ্টেন পেনটা বের করলে।—এই নাও তোমার কলম। কোন্ ভাগ্যবানকে চিঠি লিখবে কে জানে।

—মনে আছে যা হোক্। বাঃ বেশ ছোটখাটো তো। কত দাম?

পরের অংশের বিদ্রূপটা যেন কানেই গেল না ওর।

—উপহারের বিচার কি দাম দিয়ে করবে নাকি?

সরমা হাসলে।—তা নয়। বুঝেসুঝে হিসেব করে চলবার উপদেশ দিতাম।

—এখন থেকেই?

—এখনই আমার কথায় কান দাও না, পরে বড়ো শুনবে!

সরমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সঞ্জীব বললে, শুনবো গো শুনবো।

—এতও পারো। সরমা হাসলে।

তারপর দুজনেই চুপচাপ।

এদিকে রাত বাড়ে। হিম পড়তে শুরু করে। তবু, চমৎকার

একটা আমেজ, কত কত তারায় ভরা আকাশ। বাতাস ঠান্ডা। ঠান্ডা আর নরম। রেশমের মত। আর ঘুম-ঘুম রোমাঞ্চ। দয়িতস্পর্শের শিহরণ। আমলকীর পাতা নড়ে। কৃষ্ণচূড়ার পাতা নড়ে। শিমুল আর শিশু গাছের চন্দ্রছায়া কেঁপে ওঠে।

—চলো উঠি।

—নাই বা ফিরলে।

—সে কি! সঞ্জীব হাসলো।—সারা রাত এইখানে থাকবে?

সরমাও খিলখিল করে হেসে উঠলো, উঠে দাঁড়ালো।

সঞ্জীব বললে, পেঁৗছে দিয়ে আসবো?

—এটুকু পথ আমি একাই যেতে পারবো।

সরমার কণ্ঠস্বরে অভিমান ফুটে উঠলো। সঞ্জীব হয়তো বুঝতে পারলো না।

তবু বললে, চলো না, পেঁৗছে দিয়ে আসি।

—তোমাকে তো এমনিতেই এতটা পথ হাঁটতে হবে।

অর্থাৎ দুজনের গন্তব্য দু-মুখে। একজন পূবে, অন্যের পথ পশ্চিমে।

সঞ্জীব বললে, বেশ যাও তা হলে।

—তুমি যাও, আমি যাবো এখন।

কেউ আর কি আগে যেতে চায় না। শেষে সঞ্জীবই নিজের পথ ধরলো। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকালো। সরমা তখনও দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ওর দিকে চোখ রেখে।

সঞ্জীব হাসল।—কি হলো, যাবে না?

সরমাও হেসে ফেললে। কিন্তু নড়লো না।

সঞ্জীব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলো। তারপর ধীরে ধীরে গাছগুলির জমাট অন্ধকারের মধ্যে ডুব দিলো। নিশ্চল, নিশ্চুপ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সেদিকে তাকিয়ে রইলো সরমা। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। একেবারে নিঃশেষে যতক্ষণ না মিলিয়ে গেল সঞ্জীব। তারপর। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস।

বোর্ডিং-এর পথ ধরবার জন্যে পিছন ফিরতে যাচ্ছিল সরমা।

কিন্তু।

তার আগেই একজোড়া সবল হাত ওকে বোবা করে দিলো। ভয়ে বিস্ময়ে চোখ চাইবার চেষ্টা করলে সুরমা। আশঙ্কায় অক্ষম পা-দুখানা

টললো। মুখে কথা যোগালো না। ওর শরীরের আপত্তি নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

একটি দিন। শুধু একটি দিনের ইতিহাস ও বলতে পারে নি মানসীকে। সঞ্জীবকে তো নয়ই।

কতদিন কত মুহূর্ত এসেছে। মনে মনে নিজেকে দৃঢ় করেছে সরমা। না, সঞ্জীবের কাছ থেকে অন্তত ওর জীবনের কোন অন্ধকারকেই চেপে রাখবে না। কিন্তু শেষের ক্ষণে সাহস হারিয়েছে ও। ভরসাও। ভেবেছে, মিলনের ভিত আরো গভীর হোক—তারপর, তারপর।

মানসীর চোখে পড়েছে কখনো কখনো। ওর মুখের বিষণ্ণ ব্যথার প্রলেপ, ওর চোখের মাটিহারানো উদাস দৃষ্টি।

প্রশ্ন করেছে মানসী।—কি এত ভাবিস?

—না, কিছু না তো।

মানসী ভাবতো ওদের প্রেমের স্বচ্ছন্দ গতিতে বুঝি যতি পড়েছে। তবু কিছু বলতো না, প্রশ্ন করতো না।

মানসী সেদিন তখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। চাদরটা সারা গায়ে জড়িয়ে পড়ে আছে।

সরমা টুথব্রাশ ঘষতে ঘষতে সামনের ছোট বারান্দাটায় বেরিয়ে এলো।

হোস-পাইপের জলের ফুরফুরি আছড়ে পড়ছে পীচের রাস্তায়। ঝিরঝির করে চমৎকার একটা শীকরোৎক্ষেপের শব্দ বাজছে। আর পূবের আকাশে হলদে বড় সূর্য। চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভোরবেলাকার ঠাণ্ডা বাতাস।

সরমা মুখ হাত ধুয়ে আসতেই নেপালী ঝি গৌরীমায়া।—ঠাণ্ডাদি, নীচের বাকাসে চিট্টী ছিলো।

—দেখি।

সরমা চিঠিটা পড়লো। আনন্দ আর খুশীর হাসিতে ভরে উঠলো ওর মুখ। বুকে সুর বেজে উঠলো।

ছুটে গিয়ে ঘুমন্ত মানসীর পাশে বসলে। একটা ঠেলা দিয়ে ডাকলে।—মানুদি।

—উঁ।

হাসি-হাসি মুখে সরমা মানসীর পাশেই শুয়ে পড়লো। মানসীকে

দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, ওঠো ওঠো। কতক্ষণ আর ঘুমোবে।

—কেন জ্বালাচ্ছিস। ঘুমন্ত চোখ না খুলেই মানসী বললে।

—ওঠো; সুখবর আছে।

ব্যাপারটা হলো এই যে, সরমা লিখেছিল, মা, সেবারে ছোটমামার বাড়িতে সঞ্জীবকে তো তুমি দেখেছিলে। তোমার মত জানিও।

মা উত্তর দিয়েছেন, মা সরো,, তুমি এতদিন যা বুঝেছ তাই তো করে এসেছ। কোনদিন খারাপ ফল তো হয় নি।

মানসী উঠে বসতেই চিঠিটা দেখালে সরমা।

বিকেলে সঞ্জীবকে।

তারপর!

হৈচৈ ধুমধাম হলো না। রোশনচৌকি বাঁধা হলো না ফটকের মাথায়। নহবত বাজল না, সুর ধরল না সন্ধ্যার শানাই। লাল শালু আর সাটিনের চাঁদোয়া নয়। খুব ঠাণ্ডাভাবেই বিয়েটা হয়ে গেল। বাসর জাগল, বাসর কাটল।

তারপর, ফুলশয্যার রাত।

আনন্দে উচ্ছল ওরা দুজনে। মর্তের সম্বিত যেন হারিয়ে ফেলেছে। নানা ফুলে সাজান হয়েছে ঘরখানা। ফুলেরই শয্যা যেন।

চম্পা-চামেলির সুবাসে স্নিগ্ধ, মালা-মল্লিকার মোহ। খাটের বাজুতে রজনীগন্ধা আর নাম-না-জানা কি একটা রঙিন লতা জড়ান। পুষ্প-সুরভির স্নান। কোণের ভাসটায় একজোড়া শ্বেতকমল।

সঞ্জীব আপত্তি করেছিল প্রথমে। কিন্তু, সুধাদেবী আপত্তি শুনলেন না।

বললেন, এটুকু না করলে চলে না।

—কেন?

—সত্যিকারের ফুলশয্যে তো তোমাদেরই ঠাকুরপো। অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন সুধাদেবী। তারপর বললেন, চললাম ভাই, আর বিরক্ত করবো না। মনে মনে তো এরমধ্যেই গালাগালি দিচ্ছ, আধখানা রাত বৌদিই মাটি করে দিলে।

সরমা ঠোঁট টিপে হাসলে ঘোমটার আড়ালে। খাটের ওপর যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইলো। নড়লো না।

বৌদি চলে যেতেই কপাটে খিল দিয়ে এসে বিছানার ওপর বসলো সঞ্জীব।

সরমা চাপা কণ্ঠে বললে, উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন না তো?

—দিলেই বা।

সরমাও হয়তো সাহস পেল সঞ্জীবের কথায়। একটানে ঘোমটা খুললে—বাবা, ঘেমে নেয়ে গেছি। বলে বিছানা থেকে নামতে গেল। চট্ করে ওর হাতটা ধরলে সঞ্জীব।—কোথায় যাচ্ছ?

—ভয় নেই, পালাচ্ছি না। ছাড়।

—হাত ছেড়ে দিলে সঞ্জীব।

সরমা উঠে এসেই সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল। আর সেখান থেকেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বললে চাপা স্বরে, এসো না কিন্তু।

সঞ্জীব সাড়া দিল না। হয়তো হাসল, সরমা দেখতে পেল না। আলো জেবলে খাটের ওপর দেহ ছড়িয়ে দিলে সরমা। চোখ বুজলো।

—ও কি! শুয়ে পড়লে যে!

আব্দারে শিশুর মত ঢলা গলায় সরমা বললে, ঘুম পাচ্ছে আমার।

—আমার যে ঘুম পাচ্ছে না।

—তবে জেগে জেগে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক। আমি ততক্ষণ ঘুমিয়ে নিই। বলেই মুখ ফেরালে সরমা, হাসতে হাসতে। চোখ চাইলে।

বুকের নীচে একটা বালিশ টেনে নিল সঞ্জীব। তারপর সরমার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে একখানা হাত টেনে নিয়ে সবমার অনামিকায় আংটিটা পরিয়ে দিলো।

মৃদু হেসে আংটির পাথরটার দিকে তাকালে সরমা, মুগ্ধচোখে। প্রশ্ন করলে, কি পাথর এটা?

—আতসী। এর আরেক নাম হলো চন্দ্রকান্তমণি। চাঁদের কিরণে চকমক করে, সূর্যের কিরণে আগুন জবালানো যায়। বেশ কাব্য করে বললে সঞ্জীব।

আর সরমার মনে পড়ে গেলে আরেকটা কথা।—চাঁদের জ্যোৎস্নাটা মিথ্যে মায়া, মন ভোলাতেই পারে। সূর্য সত্য। জীবনকে জীবন্ত করে তোলে। সত্য মায়া নয়, মিথ্যের মত অনিষ্ট করে না সে। মারা যাবার আগে সরমার বাবা উপদেশ দিয়েছিলেন মেয়েকে। ইস্কুলের মাস্টার ছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন। ছেলে-মেয়েদের আজীবন শুধু উপদেশই দিয়ে গেছেন। আর কিছু নয়।

সম্প্রদানের সময় মার চোখের জল দেখে বাবাকে মনে পড়েছিল

সরমার। তারপর হাসি হল্লা, রহস্য রসিকতার মাঝে ভুলে গিয়েছিল।

সঞ্জীবের কথার সঙ্গে বাবার উপদেশটার কোথায় যেন একটা ক্ষীণতম যোগসূত্র আছে। রঙধনুকের আবেশবৈচিত্র্যে দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছিল ওর, আবার যেন চোখ ফিরে পেল। রামধনুর আড়ালে স্পষ্ট আর গভীর একটা কালো দাগ। কলঙ্কের অলঙ্কার।

খচ্ করে বুকের মাঝে এসে বিঁধলো একটুকরো বিস্মৃত ছবি।

একটা দিন। শুধু একটা দিনের ইতিহাস বলতে পারে নি ও। না মানসীকে, না সঞ্জীবকে। বহুদিন. বহুবার চেষ্টা করেছে। অবোধ্য এক অস্বস্তিতে নিজেই জ্বলেছে। ভয় আর আশঙ্কা। হয়তো তাল কাটবে, সুর হারাবে। সুস্থছন্দে গড়া ওদের মুগ্ধস্রোত জীবনের ঘুঙুর হয়তো বা বেতালা বেজে উঠবে।

এই আশঙ্কাতেই বলি বলি করেও বলে উঠতে পারে নি।

শুশ্রূষকের চাকরিতে ইস্তাফা দেয় নি সরমা। সঞ্জীবের কিছুটা অমত ছিল, তবু বুঝিয়ে রাজী করাল তাকে। বাবা কটা টাকাই বা রেখে গেছেন! আর জামাইয়ের টাকায় তো সংসার চালান যায় না। তাই, ক-টা মাস অপেক্ষা করতে বলেছে সরমা। ছোট ভাই সৌমেন আই এস-সি পাশ করেছে—চেষ্টাও করছে চাকরির। তখন আর হাসপাতালের চাকরি রাখবে না। না, একেবারে ছেড়ে দেবে কেন! যথেষ্ট অর্থ আর উদ্দীপনা খরচ করে নার্সিং শিখতে হয়েছে ওকে।

সেদিন হাসপাতাল থেকে ফিরে বেশ বদল করতে করতে সঞ্জীবের কণ্ঠস্বর কানে এলো ওর। তা হলে এর মধ্যেই ফিরে এসেছে! কিন্তু একা নয়। আরো কে যেন রয়েছে। গলা শুনতে পেল সরমা।

হাতে মুখে জল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সরমা এসে দাঁড়াল আয়নাটার সামনে। গতক্লম শ্রান্তির স্বেদবিন্দু সারা দেহে। চোখের কোণে সাময়িক লুপ্তলাবণ্যের রেখা। চম্পাবরণ একখানা শাড়ী বের করে পরলো সরমা। আর হাঁসুলিগলা ব্লাউজ—রঙ মিলিয়ে। সুরভি-বিন্দু ছিটিয়ে নিলে এখানে ওখানে। নিজের প্রসাধন-প্রসাধিত রূপ দেখলে কিছুক্ষণ।

তারপর, খাটের ওপর বালিশে ঠেস দিয়ে বসলে দু সেকেন্ড। ওদিকের কেদারাটায় উঠে গেল। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বই-কাগজগুলো

উল্টে দেখতে শুরু করলো। অকারণে শব্দ করলে, কখনও পেয়ালা-পিরিচের, কখনও বা হাত থেকে বই ফেলে। চাবির থোকাটা ঝনঝন করলো, দরজার খিলটা একবার লাগালো, একবার খুললো। শুকনো কাশি কাশলো। শেষে চীৎকার করে ঝি দুখীর-মাকে ডাক দিলো।

একটু পরেই সঞ্জীব উঠে এলো বাইরের ঘর থেকে।

—একজন বন্ধু এসেছে। বাইরে গিয়েছিল, ক-মাস পরে ফিরেছে। বিয়ের সময় তো আসতে পারে নি, তাই আজ এখানে ফিরেই এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আজ বোধহয় আর সিনেমায় যাওয়া হলো না।

সরমা অনুযোগ করলে।—সারাদিন খেটেখুটে এসেও তোমার দেখা পাওয়া যায় না। বন্ধু। অন্য সময়ে যেন আসতে পারে না।

—আহা, ওর কি দোষ বলো। সঞ্জীব বোঝাতে চাইলো।

সরমা উত্তর দিলে, আজই তো প্রথম নয়। রোজই তো তোমার একটা না একটা লেগেই আছে।

সঞ্জীব হাসলে।—কি করবো বলো! বন্ধুবান্ধবরা তা নইলে যে বৌপাগলা বলবে। এমনিতেই তো বলে, আমাকে নাকি তুমি আঁচলে বেঁধে রেখেছ।

সরমাও হেসে ফেললে। বললে, বলুকগে। সকালে তো দু-মিনিট কথা বলবার সময় পাই না। দুপুরে তুমিও বেরিয়ে যাও, আমিও বাইরে থাকি। একা-একা চুপচাপ বসে থেকে আমি বাপু হাঁপিয়ে উঠি।

—কেন, বৌদির সঙ্গে তো গল্প করে কাটাতে পার।

সরমা চটে গেল।—বেশ, তাই যাচ্ছি। সন্ধ্যেবেলাটাও যদি তোমার বন্ধুদের না হলে—

—চটছো কেন?

—আমি তার চেয়ে আবার বোর্ডিয়ে ফিরে যাব। সেখানে তবু পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটে।

সঞ্জীব হেসে হাতটা চেপে ধরলো সরমার। বললে, এখন চলো তো, হিমাংশুর সঙ্গে দেখা করে আসবে।

প্রথমটা আপত্তি করে সরমা। মুখে বলে, চিড়িয়াখানার জীবজন্তু তো নই যে রোজ-রোজ একজন করে দেখতে আসবে।

মনে মনে আর কি লজ্জা পায়। তা ছাড়া ভালও লাগে না।

শেষকালে রাজী হয় ও। সঞ্জীবের পিছনে পিছনে নীচের বসবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। কি একটা পত্রিকার পাতায় চোখ ছিল হিমাংশুর।

শব্দ শুনে মাথা তুললে। নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত। মুখে মৃদু হাসি। পরক্ষণেই হিমাংশুর মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। হাত আর উঠলো না।

সরমাও চমকে উঠেছিল। সঞ্জীব লক্ষ্য করলো না, নয় তো সরমার সাদা চাদরের মত রক্তহীন মুখটা দেখতে পেত।

আলাপ করিয়ে দিলো সঞ্জীব। কিন্তু ওরা দুজনেই বড় অস্বস্তি বোধ করলো। রেহাই পেলেই যেন বাঁচে। তারপর একসময় হিমাংশু চলে গেল বিদায় নিয়ে।

সরমা ভাবলে, ও বোধহয় আর কোনদিন আসবে না।

ভুল!

দিনকয়েক পরেই আবার এলো হিমাংশু। আসতে শুরু করলো।

প্রথম প্রথম সরমার চোখে জাগতো একটা ভয়ার্ত ভাব। শঙ্কার শিহরণ। ক্রমশ ঘৃণা আর বিরক্তি বোধ করলে সরমা। কারণে অকারণে জেদ ধরে কেন সঞ্জীবের কাছে, সরমাকে ডেকে আনায় কেন। কখনো বলে, চলুন বেড়িয়ে আসি; কখনো সিনেমায়। টুকিটাকি দু-চারটে জিনিস কিনতে যাবে হয়তো সরমা আর সঞ্জীব, হিমাংশু এসে জোটে।—চলুন আমিও যাই। আর ক্ষণে ক্ষণে চোরা চোখে তাকাবে সরমার দিকে সেই কুৎসিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

সেদিন সঞ্জীব ফেরে নি তখনও। হিমাংশু এসে হাজির হলো।

সরমা ওর দিকে না তাকিয়েই বললে, উনি আসেন নি এখনও।

—তা হলে একটু অপেক্ষা করি, কি বলো? হিমাংশু হাসলো। একটু থেমে বললে, আপত্তি নেই তো তোমার? শেষের শব্দটার ওপর অতিরিক্ত জোর দিয়েই বললে।

চমকে ফিরে তাকালো সরমা। ক্রোধে ফেটে পড়লো যেন। বেশ স্পষ্ট আর দৃঢ় গলায় বললে, হ্যাঁ, আপত্তি আছে আমার। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান আপনি এখান থেকে। নির্লজ্জের মত কোনদিন আর আসবেন না এখানে।

অপ্রতিভ হয়ে উঠেছিল হিমাংশু, প্রথমটা। তাবপব হো হো করে হেসে উঠলো।

বললে, ভুল করছো সরমা। বেরিয়ে যদি যাই—

অসমাপ্ত কথার নিঃশব্দতাই যেন ভয় দেখাল।

বিস্ময়ে ক্রোধে হিমাংশুর মুখের দিকে তাকালো সরমা। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে। অপমান আর ব্যর্থতার আগুনে জ্বলছে তার চোখ দুটো!

প্রতিহিংসার আগুনে।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারলে না সরমা। পালিয়ে এলো ঘরের ভেতর। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো। সমস্ত বুক যেন ফাঁকা ফাঁকা। মাথা ঝিমঝিম করে। কি একটা বিপর্যয়ের জন্যে যেন থমকে থেমে গেছে পৃথিবী। দুনিয়ার সমস্ত কলরোল যেন হঠাৎ চুপ করেছে। শুধু অসহ্য বাতাস শিস দেয় ফিসফিস করে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পড়ে রইলো সরমা। নিশ্চুপ, নিথর।

সঞ্জীব ফিরে এসেছে। গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে সরমা। আর হাসির শব্দ। হিমাংশু আর সঞ্জীব হাসাহাসি করছে।

মনকে শক্ত করে উঠে দাঁড়ালো সরমা।

লাল, গাঢ় লাল রেশমী রঙের শাড়ীখানা জড়ালে শরীরে। যৌবন-দেহের প্রতিটি রেখা সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুললে। পুরুষের মন ভোলাবার যা কিছু ছলাকলা! রেশমের আঁট ব্লাউজের আবরণকে নিরাবরণের রূপ দিলো। মুখে মাখলো শুভ্ররেণু, চোখে কাজল টানলো। রাঙির চাকতি বুলিয়ে নিলো গালে, আর পাতলা ঠোঁটে বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিলো। হাতে-পরলো আইভরির রুলি আর স্বর্ণকঙ্কণ। গলায় দোলালে বুকছোঁয়া লাল প্রবালের মালা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। নিজের রূপে নিজেই মোহিত হয়ে গেল।

তারপর ঠোঁটে স্নিগ্ধ হাসির আবেশ এঁকে পা বাড়ালে সরমা।

সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে বললে, চলো বেড়িয়ে আসি।

আর হিমাংশুর চোখে অপরূপ মোহাবেশের চোখ রেখে মৃদু হেসে বললে, চলুন, আপনিও চলুন। একটু বেড়িয়ে আসি। সন্ধ্যের সময় ঘরের ভেতর—হাঁপিয়ে উঠি আমি।

তিনজনেই পথে বেরিয়ে পড়লো।

রাতের বুকে জ্বলন্ত মশালের মত সরমাই যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

কত হাসি, কত রসিকতা। ফুর্তিতে-আনন্দে যেন নেচে উঠেছে সরমা। চোখের কোণ ওর খুশীতে ভরে উঠেছে।

ধীরে ধীরে হেঁটে চললো ওরা। আর সরমার মুখে অনর্গল কথা। কথা, কথা, কথা। আর উচ্ছল হাসির তুফান। কখনো সঞ্জীবের গায়ে ঢলে পড়ছে, কখনো হিমাংশুর গায়ে।

পশ্চিমাকাশের জাফরানের বন ক্রমশ নীলাভ হয়ে এলো। নামলো ধূসর অন্ধকার। শিশু-সন্ধ্যার বাতাস কালো হয়ে এলো। একটা, দুটো, অনেক অনেক তারার ফুল ফুটেছে আকাশেব বাগিচায়। চুপে চুপে চাঁদ এলো একলাটি। ভিড়-ভিড় সান্ধ্যভ্রমণ্ণাদের জনতায় এসে মিশে গেল ওবা। জনতাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

সবুজ ঘাসেব জাজিম পাতা বযেছে পাযেব নীচে। দু-পাশে ল্যাম্পপোস্টেব সাবি। আলোব মালা। দূবে দূবে গাছগাছালিব শ্যামল অন্ধকাবেব বুকে দিগন্ত দিক হাবিযেছে যেন। কৃষ্ণচূড়া আব আমলকী গাছেব নীচে চাঁদেব ছাযা পড়েছে। আ' লা নেই, আওযাজ নেই।

সবমাকে উৎফুল্ল দেখায। হাসি আব হাসি। কথা আব কথা। হঠাৎ যেন আনন্দে মাতাল হযে উঠেছে ও। ওব মদো রক্তে নতুন কবে যেন উন্মাদনা জেগেছে। ঘুঙুবেব মিহি মিঠে বোল বেজে চলেছে যেন ওব বুকেব ভেতব।

কখনো ঢলে পড়ছে হিমাংশুব গাযে, কখনো সঞ্জীবেব হাতটা জডিযে ধবছে।

—জানো, হাসপাতালে একটা লোক না এমন তাকিযে থাকতো আমাব দিকে যেন গিলে খাবে। সশব্দে হেসে উঠলো সবমা।

সঞ্জীবও হাসলো।

—জানেন হিমাংশুবাবু, সবমাব কথা আটকে যায় হাসিব তোড়ে, লোকটা একদিন না আবাব হেসে ওঠে সবমা।

কি ব্যাপাবটা তাই বলো। সঞ্জীবও না হেসে পাবে না।

লোকটা না একদিন আমাব পেছনে পেছনে এখান অবধি ধাওযা কবেছিল। খিল্‌খিল্‌ কবে হেসে ওঠে আবাব।

সস্মিত হাসি হেসে সঞ্জীব প্রশ্ন কবে, তাবপব?

—ঐ যে গাছটা দেখছো, একদিন তুমি চলে গেলে, তাবপব দাঁড়িযে আছি আবাব হেসে গডিযে পড়লো সবমা।

– জানেন হিমাংশুবাবু—

কিন্তু কোথায হিমাংশুবাবু! চাবিদিকে তাকিযে দেখলে সঞ্জীব। হিমাংশু! হিমাংশু? কোথায গেল হিমাংশু? সঞ্জীব চিন্তিত হযে উঠলো।

আব সবমা সশব্দে হেসে জডিযে ধবলো সঞ্জীবকে। আবেকটু হলেই হযতো পড়ে যেত ও।

হাসতে হাসতে বললে, পালিয়েছে।

—মানে?

সরমার মুখ থেকে হাসি অন্তর্হিত হলো। বললে, শোন। তোমার কাছ থেকে কোন কথাই কোনদিন লুকিয়ে রাখি নি আমি। একটা দিন, শুধু একটা দিনের কথা তোমাকে বলতে পারি নি।

সপ্রশ্ন চোখে তাকালে সঞ্জীব। সরমার দিকে তাকিয়ে রইল।

অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে সরমাকে। সমস্ত মুখখানা যেন ওর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভোরের সূর্যের মত রক্তিমাভা ফুটে উঠেছে ওর সারা দেহে। নিষ্কলুষ আগুনের মত উজ্জ্বল। অনামিকার আংটিতে বাঁধা আতসী পাথরটাও যেন জ্বলে উঠেছে।

পুবের আকাশে ওটা চাঁদ নয়!

[১৩৫৬]

স হ যো গ

রেলের কলোনী। পাহাড় ফাটিয়ে টানেল কেটে এগিয়ে গেছে রেলের লাইন। জঙ্গল সাফ করেছে, জাঙ্গাল বেঁধেছে। রূপনারায়ণ আর মহানদী, কংসবতী আর মধুমাটির মত হাজারো ছোট বড় নদী। তন্বীশ্যামার শীর্ণ দেহ কোনটির, আর কোনটি বা স্তনিত তরঙ্গিণী।

অর্থপিপাসু প্রয়োজনের মন কিন্তু রসাহরণ করতে ছাড়ে নি। বিশাল-দর্শন লোহার থাম বড় বড় টি আর জয়েস্ট, য়্যাঙ্গেল আর স্টিলের পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছে নাগরাশ্লেষী নদীর বুক। ইস্পাতের আঁট-কাঁচুলির চাপে থেমে থিতিয়ে গেছে অধীর স্পন্দন! নাগরী নদী য়্যানিকাটের জানালা দিয়ে লুকিয়ে সাগর দেখে। শাড়ীর পাড়ের মত এক জোড়া রেল লাইন ব্রিজের ওপর। এসে ঢুকেছে কলোনীর স্টেশনে।

পূবের প্লাটফর্ম থেকে দূর পশ্চিমের ওয়ার্কশপ অবধি লম্বা লাল কাঁকরের রাস্তা। খানিকটা সোজা গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়েছে একটা ভাঙ্গা পাহাড়ের গায়ে। তারপর ট্রলী লাইনের গা ঘেঁষে ঢুকে গেছে কারখানার ভেতর।

দক্ষিণ পাড়াটা অফিসারদের। এদিকটা লাল কাঁকর নয়, পিচ-ঢালা চিক্‌চিকে মেট্যাল রোড। ভোর-সকালে হোসপাইপের জলের ফুরফুরি লেগে স্নিগ্ধ আর কমনীয় হয়ে ওঠে দেওদারের সবুজ পাতা। এভিন্যু গোছের সড়ক, দুপাশে দেবদারু আর সুপুরি গাছ। অশোক আর আমলকী দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচিয়ে। স্পঞ্জের মত নরম হলদে মুচকুন্দের পাপড়ি।

শেষ-দক্ষিণের সবচেয়ে বড় বাংলোখানাই কর্নেল জনসনের।

বিরাট বাগান বাংলোর সামনে। কত রকম-ধরনের ফল আর ফুল। রাঙা লতা আর রঙিন পাতা। চওড়া ফটক থেকে পর্চের নীচে অবধি একটা ছোট্ট সরু রাস্তা। নুড়ি পাথরের রাস্তাটার দুধারে ঝাউয়ের সারি। গুঁড়ির চারপাশে চক্রাকারে সাজানো মার্বেলের মালা। দিনের রোদ রুখতে দোতলার বারান্দাটায় টাঙানো থাকে সবুজ চিকের পর্দা।

বিস্তৃত বাগিচায় পাতা আছে সবুজ ঘাসের জাজিম। কাঁটাবেড়ার

পাশে পাশে সাদা ধবধবে অটল অনড় ইউক্লিপটাসের গ‍ুঁড়ি। ক্রিসেন্থিমাম আর কাঠগোলাপ। মৌসুমী ফোটে মৌসুম বুঝে। ছোট ঝরনার মত পাহাড়ী নদী পিয়ালীর ওপর কংক্রিটের সাঁকো। জনসনের জনশূন্য হারেম দেখা যায় সেখান থেকে।

এত বড় বাড়ীটায় একা থাকেন কর্নেল জনসন। একা, সম্পূর্ণ একা। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, নেই কন্যারত্ন। কোন আত্মীয় অনাত্মীয়ারও টিকি দেখা যায় নি এ বাড়িতে।

চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল জনসন। কলোনীর লোকের চোখে অদ্ভুত এক গোপন রহস্য। একে ঘিরেই অনাবিষ্কৃত এক আশঙ্কার ছাপ প্রতিটি বাসিন্দার বুকে। বাবুলডিহির ডিরেক্টর এই কর্নেল জনসন।

জনসন কর্নেলের ধাপ অবধি উঠেছিলেন মহাযুদ্ধে। মেসোপটেমিয়ার এক ট্রেঞ্চ-ফাইটে বেয়নেটের খোঁচা লেগে গলে গিয়েছিলো বাঁ চোখের তারা। লণ্ডনের একটা পাইপ-য়্যাক্সিডেণ্টে জখম হয়ে ডান হাতটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে কাঁধ থেকে। লোকে বলে বসন্ত, তা নয়, যৌবনের য়্যাক্নি ভালগারিসের দাগ সমস্ত মুখে। ডান দিকের কোটের হাতাটা লটপট করে, বাঁ চোখের ঝিমিয়ে-পড়া পাতা দুটোর মাঝখানে খানিকটা লালচে মাংস। মুখে সব মিলে একটা বীভৎসতার ছাপ রেখে গেছে।

জনসনের জরু ছিল কিনা তাই নিয়ে মাতামাতি করে বুড়োরা। অনেকের ধারণা মিসেস জনসনও ছিল একজন। সে বোধ হয় কোন আমেরিকান ডলারপতির সংগে পালিয়েছে। বাংলো-পিওন চোখেলাল নাকি দেখেছে, জনসন রোজ সন্ধ্যার সময় একগোছা ফোটোগ্রাফ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। সময়ে সময়ে তাঁর ডান চোখ বেয়ে নাকি ঝরঝর করে জল পড়ে। ওয়াগন শপের ফোরম্যান উত্তম সিং দেখেছে হুইলার থেকে সংস্কৃত গীতা কিনতে। ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের গুরখা প্রহরী একজন বলেছিলো, রাতের বেলায় জনসন নাকি ছদ্মবেশে লেবার কোয়ার্টার্স দেখে বেড়ান। তাদের দুঃখ দুর্দশা ছলছল চোখে তাকিয়ে দেখে ফরফরিয়ে বের করে দেন পাঁচ দশ টাকার নোট, ট্রাউজারের পকেট থেকে।

বাঁ হাতে নাম সই থেকে সাতপাতা ড্রাফ্‌ট অবধি করতে পারেন জনসন সাহেব—বাঁ হাতে। বাবুলডিহির পার্কে পার্টিতে, ক্লাবে কনফারেন্সে সবচেয়ে বেশী সম্মান জনসনের। ডোরা ডরোথীদের ভয়-ভক্তি সাজশ্রদ্ধা শুধু জনসনকে ঘিরে। কটা আর কালো, ট্যান কালার আর টানা চোখের চাপা বুকে যে ন্যাশনাল য়্যান্থেমের সুর বাজে, সে

গানের কিং হলেন এই কর্নেল জনসন। জনসন কিন্তু নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন এসব থেকে। চার্চে তিনি অলটারের সামনে গিয়ে বসেন। পারফিউমড চুলের সুবাসেও মুখ ফেরান না।

এ হেন কর্নেল জনসনের বাড়ি এটা।

জোর কদমে ফিরে আসছিল শিবনাথ।

জংশন স্টেশনের অসংখ্য জোড়া জোড়া লাইন গড়িয়ে গেছে। লেবেল ক্রসিংয়ের দুধারে এক্সপ্যান্ডেড মেট্যালের গেট। ওভারব্রিজ দিয়ে পার হতে সময় লাগে, তাই বিপদ অগ্রাহ্য করে হেঁটে চললো শিবনাথ। মনটা আজ তার ফুর্তিতে ভরে আছে।

লম্বা কোয়ার্টারের রেঞ্জ। টালির ছাদ, খান তিনেক ঘর, জলের কল। এই ধরনের গায়ে গা লাগানো দশখানা কোয়ার্টার নিয়ে এক একটা ইউনিট। দাঁত বের করা ইটের দেয়াল, পয়েণ্টিঙের সুড়কি খসে গেছে বহুদিন। ছোট ছোট গরাদে জানালা, আর কাঠের জাফরিতে ঘেরা বারান্দা। অন্য দিন হলে বেকার শিবনাথ কয়েকটি বিশেষ জানালায় অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছড়াতো। আজ আর প্রয়োজন নেই, খোরাক জুটে গেছে।

গির্জেটার পাশ দিয়ে এগিয়ে চললো শিবনাথ। মনে মনে রোমন্থন করছিল সদ্য দেখা ঘটনাটা। রাণীকে বলতে হবে আজই।

কোল ভিল ওঁরাও আর মুণ্ডা, যার মাত্র একপুরুষ হলো যীশুর বাণী শুনেছে মিশনারীদের মুখে, না খেতে পেয়ে টাকার মর্ম বুঝেছে এবং বুঝে অন্ধকার থেকে আলোকে এসে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তাদের জন্যে রেল কোম্পানী বানিয়ে দিয়েছে অভ্রংলিহ বনস্পতির মত এক বিরাট গির্জে। ক্রিস্টমাসের সময় ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চানদের এই গির্জে সাজাতে কোম্পানী থেকে খরচ স্যাংশন করে বারো হাজার টাকা। অথচ, ছোট ছোট কোয়ার্টারের ফাটা ছাদে পিচ-ডামরের পটি লাগাবার জন্যে এ-বর্ষায় দরখাস্ত করলে ও-বর্ষায় আলকাতরার তুলি বুলিয়ে দিয়ে যাবে। তা হোক, গির্জেটার কোথাও নেই এতটুকু খুঁত, পুরোদস্তুর ফ্যাশনেব্‌ল।

গির্জে থেকে আশি গজ ব্যবধান রেখে শুরু হয়েছে কেরানীবাবুদের কোয়ার্টার। কয়েকটি বাঙালী পরিবার এই কসমোপলিটান আবহাওয়ার মধ্যে দিন কাটায়।

কি মনে করে খিড়কির দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল সে। চকিতে দেখলে

শাড়ীর আঁচল দ্বলিয়ে কে যেন ঘরে ঢ্বকলো। দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢ্বকলো শিবনাথ। শব্দ শ্বনে ফিরে তাকালো রাণী, ম্বহ্বর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল তার ম্বখ।

চাপা স্বরে ধমক দিলো শিবনাথ।

—কোথায় গিয়েছিলে?

ম্বখ নামিয়ে রাণী ভাঙা ভাঙা করে উত্তর দিলে।—তেল ছিল না।

—কোথায় গিয়েছিলে, কোথায়?

—অমিতাদির কাছে। এবারেও মাথা তুলতে পারলে না রাণী।

—হ্বঁ। গ্বম হয়ে রইলো শিবনাথ কিছ্বক্ষণের জন্যে। সন্দেহের বিষবাষ্পে জ্বলে উঠলো ওর সারা শরীর।

বললে, অমিতাদি! বীরেনবাব্বর শালী হবার এত শখ!

প্রতিবাদের ক্রুদ্ধ চোখে একবার চকিতে চাইলো রাণী, তারপর নিঃশব্দে নিজের কাজে চলে গেল।

মিথ্যে সন্দেহ? কে জানে! শিবনাথ নিজেকে কোন দিনই ব্বঝে উঠতে পারে নি। এ কি নিজেরই দ্বর্বলতা, না পারিপার্শ্বিকের প্রভাব? কে জানে।

বিয়ের পরও বছরখানেক বেশ আনন্দেই কাটিয়েছে দ্বজনে। তারপর আগমন ঘটলো এই বীরেনের। পাশের কোয়ার্টারে বউ অমিতাকে নিয়ে এসে কায়েমী আসন গাড়লো ওরা। ছিমছিমে চালাক চতুর বউ, কোন দিক থেকেই বীরেনকে অস্বখী মনে করার কারণ নেই। তব্ব, তব্ব কেমন যেন একটা জাতক্রোধ গজিয়ে উঠেছে শিবনাথের মনে—রাণীকে কোনদিন বীরেনের সঙ্গে কথা বলতে দেখে নি, তব্ব।

প্রথম প্রথম একটা বোবাকান্নার ব্যথা পেত শিবনাথ। সন্দেহ হত, অথচ বলতে পারতো না লজ্জার খাতিরে। সন্দেহটা কি সত্যিই মিথ্যে? তা হলে কথায় কথায় শিবনাথকে বীরেনের সঙ্গে তুলনা করতো কেন রাণী!—জানো, বীরেনবাব্ব বয়সে তোমার চেয়ে বড় বই ছোট নয়, তব্ব ও'র তুলনায় তুমি যেন ব্বড়িয়ে যাচ্ছো। একদিন বলে ফেলেছিল রাণী।—জানো, বীরেনবাব্ব নাকি বি এ পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন! বি এ পরীক্ষায় প্রথম তো অনেকেই হয়, বীরেনের প্রথম হওয়াটাই কি রাণীর কাছে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার!—বীরেনবাব্বর প্রোমোশন হয়েছে, তিরানব্বই টাকা মাইনে হলো, শ্বনেছো? বাকীটা নিজের মনেই ভেবে নিতো শিবনাথ। হয়তো রাণী বলতে চায় যে, তুমি এখনও একটা চাকরিই জোটাতে পারলে না।

কথাটা অবশ্য অন্যায় নয়। যক্ষ্মায় ভুগছেন শিবনাথের বাবা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে 'লোন' নেয়া টাকায় সংসার চলছে। শিবনাথের এবার একটা চাকরি না করলেই নয়। অথচ, চাকরি পায় কোথায় বেচারা?

নিজের ক্ষুদ্রতাটুকু যত ঢাকবার চেষ্টা করে শিবনাথ, রাণী ততই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়।

শেষ অবধি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না শিবনাথ। পষ্টাপষ্টি বলেই ফেললে একদিন। রাতের অন্ধকারে রাণীর কানের পাশটা লাল হয়ে উঠেছিল কিনা দেখতে পায় নি সে।

—পাশের বাড়ীর সঙ্গে অত দহরম-মহরম ভালো নয়। একটু কুৎসিত ভাবেই বলেছিল কথাটা। নিষেধ সত্ত্বেও আজ আবার পাশের কোয়ার্টারে যেতে দেখে তাই সন্দেহটা ঘনীভূত হলো।

সকালের ঘটনাটা ভাবতে ভাবতে কান্না পাচ্ছিল রাণীর। পুরুষ মানুষ মাত্রেই কি এমনি অমানুষ হয়? চোখ ঠেলে জল আসছিল ওর।

একটা টুলে বসে রুগ্ন শ্বশুরের যন্ত্রণাকাতর মুখটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিল রাণী।

রাত গভীর হয়ে আসছে। দূরের গির্জেয় ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল। কারখানার চিমনি থেকে আকাশে ছিটিয়ে পড়েছে খানিকটা জাফরানী আগুনের হলকা। পৃথিবী নিঃঝুম।

মালগাড়ীর শাণ্টিং আর ইঞ্জিন-শেডের দু একটা টুকরো বাঁশীর কাতরানি ভেসে আসে! ডেঞ্জার হুইস্‌ল্‌ আর ইস্পাতের লাইনে গাড়ীর গড়গড়ানি।

শিবনাথের বাবার অসহ্য চীৎকার। মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিলো রাণী। বুড়োর চোখের কোণে ফোঁটা ফোঁটা জল জমে ওঠে। নিশ্বাস টানতে কষ্ট হয়। সজল চোখে তাকিয়ে দেখছিলো রাণী।

কাছের কোন একটা বাড়ীতে ঝন্‌ঝন্‌ করে কাঁসার শব্দ বেজে উঠলো। হয়তো হাত ছিটকে পড়ে গেছে বাটি আর ঝিনুক। ককিয়ে কেঁদে উঠলো একটা ছিঁচকাঁদুনী মেয়ে। শিবনাথের ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারেই বিছানার চারপাশে হাত বাড়িয়ে রাণীর খোঁজ করলে। ধক্‌ করে উঠলো ওর বুকের ভেতরটা। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে তন্ন-তন্ন করে দেখলে চারপাশ। না! কোথাও নেই। তবে কি—

হঠাৎ মনে হলো হয়তো বাবার অসুখ বেড়েছে। পা টিপে টিপে এসে দেখে-গেল। হাঁ, রাণী বসে আছে বাবার কাছে। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো। ব্যর্থতার ব্যথাও পেল একটু। যা সন্দেহ করেছিল তা মিথ্যা প্রমানিত হয়ে যেন ব্যর্থতা এনে দিলো ওর মনে। যদি কোন রকমে সন্দেহটা সত্যি হতো!

পা টিপে টিপে ফিরে এসে ঘুমোবার চেষ্টা করলে শিবনাথ।

বুড়ো বাপ কাশতে শুরু করেছে আবার।

পিকদানির জলটা লাল হয়ে উঠলো! ভয়ে আঁতকে উঠলো রাণী।

কাশি থামিয়ে গোঙাতে শুরু করলে বুড়ো। শ্বশুরের কষ্ট আর সহ্য হচ্ছিল না রাণীর। মুখের দিকে তাকালেই বুকটা ব্যথিয়ে ওঠে। দূরে কম্বলের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে শাশুড়ী আব ননদ। তাদের দিকে এক চোখ তাকিয়ে নিয়ে পিকদানিটা সাফ করতে বেরিয়ে গেল রাণী। একটু পরেই পিকদানিটা রেখে দিয়ে শিবনাথকে ঠেলে ওঠাতে গেল পাশের ঘরে। সকলে ঘুমিয়ে আছে, কেমন যেন গা ছমছম করে, ভয় করে।

বার কয়েক ঠেলা দিতেই শিবনাথ চোখ চাইলে।

—কি ঘুম বাপু তোমার!

—তা বলে কি রাত জেগে আমাকেও মরতে হবে নাকি। খেঁকিয়ে উঠলো শিবনাথ। ধাক্কা খেয়ে চুপ করে গেল রাণী। তারপর আস্তে আস্তে বললে, যাও ডাক্তাববাবুকে একবার ডেকে নিয়ে এসো।

—ফি দেবার টাকা আছে? তুমি বরং যাও, তোমার চাঁদ মুখ দেখলে হয়তো মন গলতে পারে রাজেন ডাক্তারের।

রাণী চটলো না। বললে, যাও লক্ষ্মীটি একবারটি যাও আজ। তোমার পায়ে পড়ি।

উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো শিবনাথ।

পাশের কোয়ার্টারে দুনিয়াব দুঃখ ভুলে ঘুমোচ্ছিল বীরেন আর অমিতা। একজোড়া লিকলিকে সাপ যেন নরম লেপের উষ্ণ আস্বাদে আত্মহারা। বাইরের বিঘ্নে তাদের আরামনিদ্রা ভাঙে না।

এত আরামের গোড়ায় আছে তিরানব্বই টাকার চাকরি। মাসের শেষে টাকা ক-টা রীতিমত উপার্জন করে বীরেন। তিন বছর আগে তিরিশ টাকায় ঢুকে তিরানব্বই টাকায় প্রোমোশন পেয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ফুর্তিতে আর ফুরসতে কাটিয়ে দেয় বারোমাস। অমিতার নীল চোখের

তারায় তারায় আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়। খুশীয়াল রাতের স্তব্ধতা ভেঙে খিলখিল করে হেসে ওঠে যখন অমিতা, মনে হয় পৃথিবীতে বাস করার কায়েমী দাবি আছে যেন একমাত্র ওদেরই।

শিবনাথের বাবার চীৎকার আর কাশি গা-সওয়া হয়ে গেছে। কানে ঢোকে না আর। ব্যবধান শুধু দশ ইঞ্চি ইঁটের দেয়াল, তবু ঘুম ভাঙে না।

আজ কিন্তু চাদরটা কোমরে ঠেলে দিয়ে উঠে বসলো অমিতা।

—কি হলো?

—আজ যেন বড় বেশী গোঙাচ্ছে বুড়ো।

হঠাৎ গোঙানি থামলো। নিশ্চুপ কাটলো খানিক। কান পেতে পেতে শুনলে অমিতা। একটা টিকটিকিও টিকটিক করে না, একটা ঝিঁঝিও ডাকে না। গুডস্ ট্রেনের শান্টিং গেছে থেমে। নিঃশব্দতার মাঝে একা জেগে বসে থাকে সে। বীরেন হয়তো আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে অমিতা।

একটু পরেই হৈচৈ করে কেঁদে উঠলো সকলে।

তারপর শুরু হলো কঁকিয়ে কঁকিয়ে, বিনিয়ে বিনিয়ে, সুর করে করে কান্না, রাণী কাঁদছে শিবনাথের মা কাঁদছে, শিবনাথের বোন কাঁদছে।

কেমন যেন বিশ্রী আর বিরক্তিকর ঠেকে অমিতার।

বীরেনকে একটা চিমটি কেটে অমিতা বললে, শুনছো?

—কি?

—পটল তুললো বোধ হয়।

—হুঁ! বালিশে গোঁজা মুখটা হয়তো হাসলো একবার।

—হাঁকডাক করলে সাড়া দিও না যেন।

—পাগল হই নি তো।

—হও নি, হতে কতক্ষণ। না, সত্যি বলে দিচ্ছি, এই বৃষ্টি বাদলের দিনে শ্মশানে-টশানে যাওয়া চলবে না।

—বেচ্ গো বেচ্, ছোও দিনি একন।

চাদরের ভেতর থেকে বাঁ হাতটা বের করে অমিতার নরম হাতটা টিপে দিলে বীরেন। সরু কোমরে হাতের একটা পাক দিয়ে সজোরে জড়িয়ে ধরে টেনে শুইয়ে দিলে অমিতাকে।

খালি পা, গায়ে একটা উড়নি, মাথা নেড়া। শিবনাথ বেড়াতে বেরিয়েছিল।

প্রতিদিন ভোরের অন্ধকারে বেড়াতে আসে সে এদিকে। একটা নেশা তার।

মদের নেশা ছাড়া যায়, কিন্তু এ যে দেখার নেশা। পূবের আকাশ রাঙা হবার আগেই শিরশিরে বাতাস গায়ে মেখে বেড়াতে আসে সে। একটা দিন না আসতে পারলে মনে হয় যেন কত ক্ষতি হয়ে গেল।

দক্ষিণের লতাপাতায় ঘেরা কুঞ্জগুলো ছাড়িয়ে কর্নেল জনসনের বাংলোর একটু দূরে কংক্রিটের সাদা সাঁকোটার ওপরে এসে বসলো সে। ভোরের আলো মেখে যেন দূরের সার্চলাইটটা মিইয়ে গেছে। ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগনালের লাল আলোটা থমকে সবুজ হয়ে গেল। ঐ দিকেই তাকিয়ে ছিল শিবনাথ।

—আরে শিবনাথবাবু যে!

এতখানি অন্যমনস্ক কখনও হয় না শিবনাথ। যে নেশার টানে এখানে আসে সে, সে নেশা চরিতার্থ করতে হলে মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হওয়া চলে না।

চমকে ফিরে তাকালো শিবনাথ। বীরেন আর বীরেনের স্ত্রী অমিতা। চকিতে চোখাচোখি হয়ে গেলো অমিতার সঙ্গে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি দুলিয়ে দিলে অমিতা। কি সুন্দর স্নিগ্ধ নীলিমা ওর চোখে, কৃষ্ণসারিণীর চটুল চোখকেও যেন হার মানায়। কি এক অপূর্ব জাগরম্লানিমা ওর চোখের কোলে।

—আপনিও মর্নিং ওয়াকে বেরোন নাকি? প্রশ্ন করলে বীরেন।

—হ্যাঁ। উদ্দেশ্য ঢাকবার জন্য বোকার মত হাসলে শিবনাথ।

—চলুন না একসঙ্গেই ফিরি। আড়চোখে তাকিয়ে অমিতা বললে।

শিবনাথের ইচ্ছা ছিল না মোটেই। আরো কিছুটা অপেক্ষা করলে হয়তো পুরস্কার মিলতে পারে। কিন্তু অমিতার গুচ্ছ গুচ্ছ সুবাসিত চুলের রাশ কি এক চুম্বকের আকর্ষণী ছড়িয়ে দিলো শিবনাথের সারা অঙ্গে।

বলতে হলো, বেশ চলুন।

অমিতার দিকে আর একবার তাকালে শিবনাথ। ঠোঁটে গতসন্ধ্যার রাঙের ফিকে আমেজ এখনও। ভোরবেলাকার সোনালী রোদের মতই স্বতস্ফূর্ত ওর কথা। মুখে ভোরের আকাশের মত ক্লান্তিশেষের ছাপ।

মনে মনে অমিতার পাশে রাণীকে দাঁড় করিয়ে নিজের ওপরই ঘৃণা হলো শিবনাথের। আধ হাত ঘোমটা আর এগার হাত শাড়ীতে ঢাকা

জবুথবু গোছের গ্রাম্য মেয়ে রাণী। আর অমিতা!

দিনরাত পাঠ পড়ালে অবশ্য ময়নার মুখেও বুলি শোনা যায়। সাহস হয় না তবু শিবনাথের। এমনিই তো তৃষ্ণার্তা চাতকীর মত খাঁচার ফাঁকে চোখ রাখতে দেখলে আশংকা হয়, সন্দেহ হয় রাণীর ওপর।

কিন্তু অদ্ভুত একটা মোহ ক্রমশ যেন গ্রাস করে ফেলেছে শিবনাথকে। ক্ষণিকের দর্শনে তৃপ্তির স্তিমিত অভিব্যক্তি ফোটে তার চোখে। পাওয়ার আনন্দে এতদিন সে যেন বুঝতেই পারে নি যে কিছুই পায় নি সে। স্তোকবাক্যের কুয়াশায় তাকে ভুলিয়ে রেখেছিলো রাণী। কত সহজ সারল্য অমিতার কথায়, অমিতা কত সুন্দর।

এ বাসা ছেড়ে উঠে যেতে ইচ্ছা হয় না শিবনাথের। অথচ উপায় নেই। প্রায় এক মাস হতে চললো বাপ মারা গেছে, বাসা ছাড়ার নোটিশ আসবে এইবার। উঠে যেতে হবে নতুনবাজারের দিকে। বাপের উপার্জনের উচ্ছিষ্টতে বেশী দিন আর চলবে না। চাকরি চাই। বোন সুকুমারী এবার পনেরোয় পা দিয়েছে।

অমিতার লোভনীয় আকর্ষণ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। তবু যাওয়া ভালো, বীরেনের কাছ থেকে রাণীকে দূরে রাখতে হবে।

•

মদের নেশা ছাড়া যায়, কিন্তু দেখার নেশা ছাড়া যায় না।

ভোর হতে তখনও কিছুটা বাকী। হাল্কা পায়ে এগিয়ে চললো শিবনাথ। কর্নেল জনসনের রহস্যপুরীর দিকে। জনসন—বাবুলডিহির ডিরেক্টর জনসন। যার একটা কলমের খোঁচায় আটশ টাকা বেতনের অফিসারের চাকরি বরখাস্ত হয়ে যায়, খেয়ালের মাথায় যে ষাটকে সাতশ করতে পারে কামধেনুর মত যা কিছু মঞ্জুর করতে পারে যে। বাবুল-ডিহির উই-পিঁপড়েগুলোও জানে উপকার না হোক, অনিষ্ট কতখানি করতে পারে চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল জনসন। কোন্ সাত সাগরের নীচে পাতালপুরীর গুপ্তগৃহে পড়ে আছে অজস্র মণিমুক্তা চন্দ্রহারের হাট, তার গোপন সুড়ঙ্গপথ দেখতে পেয়েছে শিবনাথ। বহুদিন থেকেই দেখে আসছে। কিন্তু ঐ বীভৎস-দর্শন দৈত্যটাকে তার বড় ভয়।

গন্তব্যে পোঁছে গেল শিবনাথ। পিয়ালী নদীর বুকে কংক্রিটের সাঁকো। পাশেই সিমেণ্টের বেদী। হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লো শিবনাথ। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জনসনের বাড়ীর দোতলার

বারান্দার দিকে।

অপেক্ষা করতে করতে ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠলো।

নদী পিয়ালীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে আকাশে উঠে গেল এক জোড়া জলপিপি। একটা মাছরাঙা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে ডাক ছাড়লো। কুলকুল করে পিয়ালীর জল বয়ে চলেছে। ক্ষীণ-স্রোতা জলের আঘাত লেগে জল-তরঙ্গের বোল ফুটছে নুড়িপাথরের মুখে। ভোরের রুপালী আলোয় মাছের আঁশের মত চিকচিক করছে করোগেটেড স্রোত।

পেছনে চাঁদমারির ময়দান অন্ধকারের বোরখা তুলে ধরেছে। একটা বিরাট ঢিবির ওপর সারি দিয়ে সাজানো কতগুলো টিনের চাকতি। এক দুই তিন অজস্র নম্বর লেখা রয়েছে তার গায়ে। সাহেব-বাচ্চারা টার্গেট প্র্যাক্‌টিস করে এই শুটিং গ্রাউণ্ডটায়।

ভোরের আলো রঙিন হয়ে ঠিকরে পড়লো ময়দানে। স্বচ্ছতোয়া পিয়ালীর সলিলস্রোত সোনালী হয়ে উঠলো। স্পষ্ট হয়ে উঠলো ময়দানের ওপরে গথিক ছাঁদে গড়া বাড়ীখানা। এখানকার বিচারালয় ছিল ওটা এককালে, এখন রাজবন্দীদের আটক রাখা হয়। ওদিকে তাকালেই ভয়ে বুকটা দুলে ওঠে শিবনাথের। এই বনেই নাকি কপালকুণ্ডলার দেখা পেয়েছিল নবকুমার। বঙ্কিমের কাপালিক আজও বেঁচে আছে। অপশক্তির সামনে আজও রয়েছে নরবলির রেওয়াজ।

চোখ ফেরালো শিবনাথ। কর্নেল জনসন ঐ দোতলার বারান্দাতেই শুয়ে থাকেন। এখনও ওঠেন নি, নেটের সাদা মশারিটা তোলা হয় নি এখনও। পিতলের পালঙ্ক গিল্টির চমক দিচ্ছে। তৃষ্ণাতুরের মত তাকিয়ে রইলো শিবনাথ। অনেক দেখেছে, আজও দেখবে সে।

একদিন দেখেছে, ফোড়েদের একটি মেয়েকে।

ছত্রিশগড় নাগপুরের রোদে তাতানো মেয়ে। উস্কুখুস্কু চুল, রাত্রির চাঞ্চল্যে। কপালে উল্কির টান, টানাটানা চোখ। বসোদ্দীপ্ত যুবতীদেহ। একখানা মোটা লালপাড় দেহাতী শাড়ী সুপুষ্ট দেহের নিম্নভাগ থেকে ওপরে উঠেছে ঘোরানো সিঁড়ির মত। দেহের প্রতিটি লোলুপ বক্র। দোতলার বারান্দায় বিদ্যুৎ-আলোর স্পর্শ লেগে অপরূপ মনে হয়েছিল তাকে। নিরাশঙ্ক অকুণ্ঠিতার মতই সদর্পে হেঁটে বেরিয়ে এসেছিল মেয়েটি। তারপর মৃদু সুরে কি একটা হিন্দী গান ভাঁজতে ভাঁজতে রাস্তা ধরে চলে গিয়েছিল।

আর একদিন দেখেছে শিবনাথ।

হাল্কা ঢেউ খেলানো চুল। বব্ ছাঁটা সোনালী রঙের চুল। কানে স্যাফায়ারের দুল। গলায় কোরালের মালা। লাল সিল্কের ঢিলে গাউন স্বাস্থ্যবতীর দেহে। গাউনের গলাটা বুকের মাঝ অবধি কাটা। কাঁধ অবধি অনাবৃত বাহু। সুডোল আর সুশুভ্র। • কলার-বোনের নীচে তরঙ্গায়িত কোমলতা। আইভরির মূর্তির মত নিখুঁত সৌন্দর্য। লিপ-স্টিকের আগুন মিইয়ে গেছে। ক্লান্তির ছাপ নেমেছে চোখের সবুজ য়্যামেথিস্টে। ফটকের সামনে একখানা মোটর এসে দাঁড়ালো। দু-বার হর্ন বাজালো ছোকরা সাহেব। খিলখিল করে হেসে জনসনকে কি একটা বললে নাইটস মিস্ট্রি লেডী। কাঠবিড়ালীর মত ক্ষুদে কদমে খুটখুট করে বেরিয়ে এলো সে।

আরামে বসে নিয়ে হাসতে হাসতে সশব্দে বন্ধ করে দিল গাড়ীর দরওয়াজা। স্খলিত তারার মত মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ দেখার নেশা, মদের নেশা নয়। কিছুতেই ছাড়তে পারে না শিবনাথ। বহুদিন ধরে এমন অনেক অনেক রূপসীর অবসাদী সৌন্দর্য দেখে আসছে সে।

আর একদিনও তো দেখেছে।

কোথায় লাগে সেই মমতাজ, যার প্রেমের আগুনে শাহানশাহ্ সাহ্‌জাহাঁ চোখের জল শুকিয়েছিলেন। বাগদাদের কোন খুবসুরত বেগম বুঝি বা! আনারের দানার মত লাল গাল। সাপের মত নীল বেণীতে জড়ানো সলমাচুমকির কাজ করা মসলিনের ওড়না। সাদা বেগমবাহার গুলাব হয়ে ওঠে গোলাপী দেহের ছোঁয়া পেয়ে। দিল্ জখম করা চোখে চোখ রাখলে দুনিয়া না-মঞ্জুর হয়ে যায়। খুনী ঠোঁটের ফাঁকে মোতির মালা দেয় হাসির ঝিলিক। মতলবী আঙিয়া মোহব্বতের মেহেরবাণী মাগে মাসুকের কাছে।

—আরে!

সেদিনের সেই বোধহয়-বাঈজীব কথা ভাবতে ভাবতে কোন্ কুক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো শিবনাথ। দৃষ্টি সরে গিয়েছিল পিয়ালী নদীটার দিকে।

হঠাৎ তাকিয়ে বিস্মিত হলো সে। অস্ফুটে বলে ফেললো—আরে!

অমিতার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বিবর্ণ হয়ে গেল অমিতার মুখ। কেন কে জানে। মৃদু হাসলে শিবনাথ তাকে দেখে, অমিতা কিন্তু অন্য দিনের মত প্রতিহাস্যের জবাব দিল না। কানের পাশটা তার লাল হয়ে উঠলো যেন মুহূর্তের জন্য। তরতর করে এগিয়ে চলে গেল অমিতা।

চোখ ফিরিয়ে শিবনাথ দেখলে মাথা হেঁট করে এগিয়ে আসছে বীরেন, পাংশু মুখে। কাছাকাছি আসতেই শুকনো হাসি হাসলে বীরেন।

খানিক কিন্তু কিন্তু করে বললে, অমিতা...মানে সি-এম-ইর বাগানে ফুল তুলতে ঢুকেছিল, আর জনসনেরও যেন দুটি ফুলে কত লোকসান হয়ে যেত। অমনি ডেকে পাঠিয়ে ধমকে দিলে আমাদের। তা নইলে আর বাংলোয় ঢুকবো কেন।

একটু চুপচাপ থেকে বীরেন আবার বললে, প্লীজ, কাউকে একথা বলবেন না যেন। এই অবাঙালীর দেশে, জানেন তো কত রকমের লোক... অন্য কিছু একটা ভাবতে পারে। মানে, অমিতা সঙ্গে ছিল শুনলে... প্লীজ শেষের দিকে শিবনাথের হাতদুটো অনুরোধেব আতিশয্যে চেপে ধরলে বীরেন।

কি যেন ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে হাঁটছিলো শিবনাথ। হয়তো চাকরির কথা। হয়তো বা অমিতার কথা। হঠাৎ নিজের মনেই হেসে শব্দ করে একটা তুড়ি দিযে ফেললো সে।

[১৩৫২]

লাটুয়া ওঝার কাহিনী

মিশিরজী বললেন, লাটুয়া ওঝার কাছে বিষ ঝাড়িয়ে আসুন বাবুজী, কিচ্ছু করতে হবে না।

লাটুয়া ওঝা?

লোকটাকে দেখার আগে যে কতবার শুনেছি নামটা। আপনা থেকেই কেমন একটা ঔৎসুক্য বোধ করছিলাম।

মরিয়ম বললে, এ তল্লাটে নাকি অমন ওঝা আর একজনও নাই। মুর্দার বুকে প্রাণ বসাতে পারে সে, সাপকে মন্ত্র দিয়ে এমন বশ করে যে চুমুক দিয়ে নিজের বিষ নিজেই টেনে নেয়।

ওঁরাও পট্টির বালোয়া কুড়ুখও সায় দিলো।

বললে, বাবুজী আপাঙের মুলে ফুঁ দিয়ে আপনার হাতে দিয়ে দেবে লাটুয়া ওঝা, কাঁকড়া বিছের গর্তে হাত দিলেও কিচ্ছু হবে না আপনার।

রত্না মাঝিন বললে, লাটুয়া ওঝার মন্ত্রপড়া পাতা দিয়ে মারাং গাড়ায় মাছ ধরি বাবু আমরা। জলে পাতা বিছিয়ে দিলে সব মাছ মরার মত পড়ে থাকে তার ওপর।

শুধু ডাক্তার সেন হাসলেন তাদের কথা শুনে। বললেন, সব বোগাস। লাটুয়া ওঝার যদি এতটুকু বিদ্যে থাকতো তা হলে আর হাসপাতালে এসে ভিড় করতো না ওঁরাও মুণ্ডা খরিয়া আর ভূম্পিরা।

তবু কেমন যেন বিশ্বাস হলো মরিয়ম, বালোয়া আর রত্না মাঝিনের কথাটাই।

বন্ধুনী ছলছল চোখে বললেন, দেখুন না একবার পরখ করে, এত লোক যখন বিশ্বাস করছে।

ঠিকেদার আত্মীয়টিও বললেন, ইন্‌জেকশন তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, লাটুয়াকে আগে দেখানোই যাক না।

শুনে উপাধ্যায়জী হাসলেন।—দেখবেন কি। চোখ আছে নাকি লাটুয়ার। সে তো অন্ধ।

অন্ধ সত্যিই।

বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ী পথ হেঁটে যখন ভুরকুণ্ডার সারনা পার হয়ে লাটুয়া ওঝার বাড়ির সামনে পেঁছিলাম তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

মাথায় এক বোঝা কাঠ নিয়ে ফিরছিলো একটি সাঁওতালী মেয়ে, প্রশ্ন করতেই প্রথমটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো সে। তারপরে দেখিয়ে দিলো লাটুয়া ওঝার বাড়িটা।

কাদামাটির দেয়াল দেয়া এক টুকরো খাপরার চাল। সামনে একটা চবুতরার নীচে হাল্কা ছোট একটা ঢেঁকি। ঢেঁকি না ঘানি ঠিক মনে নেই।

সংগে এসেছিলেন ঠিকেদার আত্মীয়টি, আর মরিয়ম।

মরিয়মই ডাক দিলো লাটুয়ার নাম ধরে। বার কয়েক ডাক দিতেই কপাটের ভাঁজ সামান্য আলগা করে উঁকি দিলো একটি মেয়ে। কপাটের আড়ালে শরীর ঢেকে রাখার চেষ্টা করে।

উদ্দেশ্যের কথা শুনে ভেতরে ডাকলো সে ইশারায়।

ঢুকলাম। অন্ধকূপের মত ছোট একখানি ঘর। নোংরা। পচাই মদ আর বাসি ভাতের গন্ধ। চাল থেকে দড়িতে বাঁধা অসংখ্য জিনিসপত্তর ঝুলছে বাদুড়ের মত। হাঁড়ি, কুমড়ো, বাঁশের চোঙা, তামাক পাতা।

প্রথমটা বুঝতে পারি নি। এতক্ষণে দেখতে পেলাম লাটুয়া ওঝাকে। এক কোণে বসে বসে ঢুলছে। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, দুটি অন্ধ চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। পাশেই একটা বুড়ি, বেশ বুঝলাম—লাটুয়ার বৌ, হুঁকোয় গুড়ুক-গুড়ুক টান দিচ্ছে আর খক্‌খক্ করে কাশছে।

আর ও পাশে দু-হাতে বুক ঢেকে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, এতক্ষণে বুঝলাম কেন কপাটের আড়ালে শরীর ঢাকার চেষ্টা করছিলো সে।

বাইশ চব্বিশ বছরের একটি ভরাযৌবন মেয়ে। কালো কুচকুচে রঙের মধ্যেও যে রূপ থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হত না। একটি নিটোল কালো পাথরের মূর্তি যেন। টানা-টানা শরমকাতর চোখ, টিকোলো নাক। আর বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা দুটি মসৃণ হাতের আড়ালে উদ্দীপ্ত যৌবনের তরঙ্গ। কোমরের কাছ থেকে হাঁটু অবধি শুধু একখানা শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড় তার দেহে। লজ্জায় তাই মুখ তুলতে পারছিলো না মেয়েটি। বাবু দেখলেই ওদের লজ্জা। পাশ থেকে এক টুকরো ময়লা চট তুলে নিয়ে বুক পিঠ ঢাকলো মেয়েটি, এগিয়ে এলো

করলো সে।

আর সে প্রশ্ন শুনে বুঝলাম মেয়েটির নাম সুরমণি।

সুরমণি ডাকলো, আপুং।

বাপ লাটুয়া ওঝা সাড়া দিলো।

মরিয়ম আর ঠিকেদার আত্মীয়টি এবার ওদের ভাষাতেই বোঝালো ব্যাপারটা।

আর সুরমণি এক মুখ হেসে বললে, আপুং বাংলা জানে গো বটে।

লাটুয়া ওঝাও হাসলো সে-কথা শুনে। অন্ধ দুটি চোখ মেলে কি যেন দেখবার চেষ্টা করে বললে, বসেন বাবুরো।

সুরমণি এগিয়ে এলো, দেখতে চাইলো কুকুরে কামড়ানো দাগগুলো। তারপর লাটুয়ার হাতখানা টেনে নিয়ে রাখলো ক্ষতটার ওপর। বেশ টের পেলাম, থরথর করে কাঁপছে বুড়ো। আনন্দে, না আশঙ্কায় বোঝা গেল না।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে লাটুয়া ওঝা বললে, বিশ নখুনে বিষ, আঠারো নখুনে পানি।

কিছুই বুঝতে পারি নি দেখে সুরমণি ব্যাখ্যা কবলো। অর্থাৎ কুকুরটার চার পায়ে যদি বিশটা নখ থাকে তাহলে বিষ আছে। আর তা না হলে জল।

সঙ্গী আত্মীয়টি জানালেন, ক-টা নখ তা তো দেখি নি।

অন্ধ লাটুযা হাসলো সে-কথা শুনে। দুটো হাত আন্দাজে আন্দাজে কি যেন খুঁজলো।

—ডুডাং নিখা? প্রশ্ন করলো সুরমণি।

ঘাড় নাড়লো লাটুয়া। সুরমণিও ওপাশে গিয়ে বসলো।

এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, এক কোণে অসংখ্য ছোট বড়ো কৌটো, হাঁড়ি, মাটির সরা।

তারই ভেতর থেকে সুরমণি একটা কৌটো এগিয়ে দিলো লাটুয়াকে।

লাটুয়া বললে, ইটা ডুডাং গাছের মূল। চন্দন আর ডুডাং ঘষে তিন দিন লাগাবি কত্তা। বিষ আখন বুকে উঠছে, ডুডাং লাগালি মাটিতে ঝইরবে।

শিকড়টা হাত বাড়িয়ে নিলাম। সুরমণি খানিকটা ঘষতে শুরু করলো। দেখিয়ে দেবে কি করে লাগাতে হয়।

শিকড় ঘষার শব্দে লাটুয়া হেসে বললে, আমার মায়েটাও বড়ো ওঝা কত্তা, সব ঝাড়ফুঁক শিখ্যে লয়ছে।

শুনে লজ্জার হাসি হেসে মুখ লুকোলো সুরমণি, মাথা হেঁট করে কাজে মন দিলো।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, আর কি ওষুধ আছে তোমার কাছে?

বুড়ো হাসলো আমার কথা শুনে। বললে, আমার নাম লাটুয়া ওঝা। সক্কল রোগের দাওয়া আমার ঘরে।

বুড়ি এতক্ষণ হুঁকো টানছিল, সেটা নামিয়ে রেখে বললে, ডাটু সাইবের কথাটা ক'ইয়ে দাও উদের।

—হুঁ ডাটু সাহেবের কথাটা। মাথা নাড়লো লাটুয়া। তারপর আবার দুটি অন্ধ চোখ মেলে কি যেন হাতড়াতে শুরু করলো।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কৌটো এগিয়ে দিলো সুরমণি।

লাটুয়া কৌটোটা খুলে সামনে ধরলো।

বললে, ইটা কুণ্টি পাথর। নাগবংশী পূজা করে পাইছিলাম। শুনো তবে কথাটো। ডাটু সাহেবেরে সাপে কাটলো সিবার। খবর পইয়া ছুইটলি। কুণ্টি পাথরটা গাড়ার জলে ধুইয়ে লাগায় দিলি সাহেবের গোরে, সাপে কাটছিলো যিখানে। মন্তর পড়লি। পাথরটা লাইগা রইলো তবু। ফের মন্তর পড়লি, পাথর তবু ঝর্যো না। তেজী মন্ত্র পড়লি, পরে পাথর ঝরলো, সব বিষ মাটিতে ঝর্যো পড়লো।

সুরমণি বললে, আর আপাংটো?

—হুঁ, ঐ আপাংটো। আবার দু-হাত কি যেন খুঁজলো।

একটা মাটির সরা এগিয়ে দিলো সুরমণি।

লাটুয়া বললে, ই. হলো আপাং। কাঁকড়া বিছার যম বটে। মুনশীবাবুর বাচ্চারে কাটছিলো বিছায়। আপাং লাগায়ে মন্তর পড়লি, মাথার বিষ চোক্ষুর পানি হয়ে ঝর্যো গেল।

লাটুয়ার থুত্থুরে বুড়ি হুঁকোটা আবার তুলে নিয়ে বললে, আর মাংরী মুরমুর উদ্‌রী?

—হুঁ। মনে পড়লো লাটুয়ার, অন্ধ চোখ দুটো আমাদের দিকে ফেলে দুটি হাত তার বাতাসে ঘুরে বেড়ালো।

সুরমণি একটা মাটির হাঁড়ি এগিয়ে দিলো লাটুয়া ওঝার দিকে। আর সেটার স্পর্শ পেয়েই স্বস্তির হাসি দেখা দিলো তার মুখে।

বললে, উদ্‌রীটো শয়তানী রোগ কত্তা, পট্টিতে উ শয়তান ঢুইকলোন তো পট্টি সাফ হ'য়ে যাবে। তো সিবার মাংরী মুরমুর বাপটো ছুট্টে

আঁয়লো। বুড়ো কান্দে তো বুড়ার মায়া কান্দে। তো দিইলাম ই কোঁকড়াইনে চক্ষু আর উদ্‌রী গাছের ঘাম। গাঁ ছাইরে ভাগলো শয়তান। বলে. হাঁড়িটা দেখালো লাটুয়া।

সুরমণি আবার কি একটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিলো, বললাম, আজ চলি, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। আবার শুনবো একদিন এসে।

সম্মতি জানালো লাটুয়া। বললে, ডুডাংটো তিনবার কইরে লাগাইবি কত্তা। আর তিনদিন পরে আবার আইসবি।

সুরমণিও এলো চবুতরা অবধি। বাইরের আলোয় এতক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওকে। দেখলাম রূপ আর দারিদ্র্যের হাত-ধরাধরি। যৌবন আর অলজ্জতা।

কাপড় নয়, টুকরো নোংরা গামছা সুরমণির কোমরে। কিন্তু কালো পাথরের এমন নিটোল মূর্তি এর আগে দেখি নি। কোন অভিজ্ঞ শিল্পীর হাতে গড়া নিখুঁত একটি যৌবনবতী নারীদেহ।

পাশাপাশি হেঁটে এলো সুরমণি, আর ওর সমস্ত শরীর ঘিরে যেন নাচের ছন্দ বাজলো।

সুরমণি হাসলো হঠাৎ। বললে, তুয়ারে আগেই দেখছি আমি। মেন্‌ছায়েবের সাথে মারাং গাড়ায় বঁইসে ছিলি ওদিন।

—আর তোর সঙ্গে কে ছিল? হেসে প্রশ্ন করলাম।

—উ আমার ঠিঁগিয়া পুরুষ বটে, বাপলা হবে উয়ার সাথে।

দুটি রুপোর টাকা গুঁজে দিলাম ওর হাতে। ডুডাং শিকড়ের দাম। তারপর দ্রুত পায়ে কোয়ার্টারের পথ ধরলাম।

কয়েক পা এগিয়ে এসে আবার ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হলো। দেখলাম, তেমনি দুটি বড়ো বড়ো কৃতজ্ঞতার চোখ মেলে সুরমণি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় চুলের জট, কিন্তু স্বাস্থ্যের জোয়ার তার লাবণ্য-ছিটানো মুখে। আর বুকের উদ্দাম তরঙ্গের মাঝখানটিতে দুলছে লাল পুঁথির হার। কানের লাল কুণ্ডল দুটো জ্বলছে রক্ত পলাশের মত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে এলাম। সুরমণির স্মৃতি নিয়ে।

ঠিকেদার আত্মীয় ছুটলেন সুতপার এলসেশিয়ান কুকুরটির নখের সংখ্যা গুনতে। বিশ নখুনে বিষ, আঠারো নখুনে পানি। বলেছে লাটুয়া ওঝা।

শুনে ডাক্তার সেন হাসলেন। বললেন, সব বুজরুকি। ওঁরাও মুণ্ডা সাঁওতালরা একদিন ডাক্তারের নাম শুনলে মারতে আসতো, আজ হাসপাতালে

ভিড় দেখবেন চলুন। লাটুয়ার ওষুধে কাজ হলে ওরা আর আমার কাছে আসতো না।

কম্পাউন্ডারবাবু হেসে বললেন, ওসব ছেড়ে দিন, রাঁচিতে ফোন করে বারোটা ইনজেকশন আনিয়ে নিন।

বন্ধুনী শুধু ভয়ের চোখে বললেন, না না। উল্টো বিপত্তি হতে পারে ইনজেকশন নিতে গিয়ে সে আমি দেখেছি, আধ হাত লম্বা ছুঁচ, পেটে দিতে হয়। তার চেয়ে কুকুরটা পাগলা কিনা দেখাই যাক না।

ভয় যে আমারও কম ছিল তা নয়। তাই সুতপার কথাতেই সায় দিলাম।

বললাম, সাঁওতালী ওষুধে এমন সব কাজ হয় যা ভাবা যায় না।

ঠিকেদার আত্মীয়টি ইতিমধ্যে ফিরে এসে জানালেন, বিশও নয়, আঠারোও নয়—উনিশ নখ কুকুরটার পায়ে।

আর ডাক্তার সেন বললেন, ওসব ছেড়ে দিন। পাগলা কুকুরেব কামড় বড়ো ভীষণ জিনিস। নিজের চোখে দেখেছি। জ্বর হবে, ভয়ে চীৎকাব করে উঠবে অনবরত। জল দুধ তেল যা দেখবেন মনে হবে কুকুব তাড়া কবে আসছে—জলাতঙ্ক বোগ বড়ো ভীষণ বোগ। ছ মাস পবে হয়তো জানা যাবে কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না দশ দিনের মধ্যে সব শেষ।

বন্ধুনী ধমক দিলেন।—কেন ভয় দেখাচ্ছেন মিছিমিছি। কুকুরটা যদি দশ দিনের মধ্যে মারা যায়, তবে তো বুঝবো পাগলা কুকুর।

ডাক্তার সেন সায় দিলেন, হ্যাঁ তা ঠিক।

সুতরাং লাটুয়া ওঝাব চিকিৎসাই চললো। আর তিনদিন পরে যেতে বলেছিল বলে আবাব ভুরকুন্ডার সারনা পার হয়ে এসে দাঁড়ালাম লাটুয়া ওঝার চবুতরার ঢেঁকিটার পাশে।

ডাকলাম সুরমণিকে।

কোন উত্তর পেলাম না।

বারকয়েক ডেকেও যখন সাড়া পেলাম না, তখন ঝাঁপি খুলে আমি আর মরিয়ম ভিতরে ঢুকবো কিনা ভাবছি, হঠাৎ দেখি এক কলসী জল নিয়ে ফিরছে সুরমণি। গাড়ায় স্নান সেরে আসছে মনে হল। সারা শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে, আর মুখে খিলখিল হাসি।

—দূর থেঁকে দেইখ্যা ভাবলি খাদানের বাবু বটেন। ছুট্যে আসছি বাবুরে দেইখ্যা।

বলে আরো এক মুখ হেসে ঝাঁপি খুলে ধরলো সুরমণি।

ভেতরে ঢুকলাম।

লাটুয়া বসে বসে ঝিমুচ্ছিল।

বললাম, বিশও নয়, আঠারোও নয়। উনিশ নখের কুকুর।

শুনে আতঙ্ক দেখা দিলো লাটুয়ার মুখে চোখে।—পাপ্পী কুকুর বটে। সুমগিয়া শয়তান আছে উয়ার বিষে।

বলে তেমনি অন্ধ চোখ দুটো আমাদের দিকে রেখে দু-হাত বাতাসে কি যেন খুঁজলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌটো তুলে ধরলো সুরমণি।

বিড়বিড় করে কি এক মন্ত্র পড়লো লাটুয়া, তারপর বললে, ইটা কাঁটকি গাছের মূল বটে। তিনদিন লাগালি সুমগিয়া বিষ খায়ে নিয়ে ভাগবে শয়তানটো।

সুরমণি শিকড়টা নিয়ে ঘষতে শুরু করলো আগের মতই। আর লাটুয়া বলতে শুরু করলো কোন্ রোগ কি দিয়ে তাড়িয়েছে ও।

বললে, নাগবংশী পূজো দিয়ে জড়ি পাইলি আমি। খাদান সাপ উঠলো সিবার, কাম বন্ধ কইরে দিলো কুলিরা।

অন্ধ লাটুয়ার হাত দুটো কি যেন খুঁজলো। খুঁজলো সাপের জড়ি। সুরমণি সঙ্গেসঙ্গে একটা মোড়ক তুলে ধরলো। আর সেটার স্পর্শ পেয়েই স্বস্তির হাসি হাসলো লাটুয়া।

বললে, কুলিদের হাতে বাইন্ধে দিলাম জড়িটো, খাদান থেকে সাপ পালায় গেল। ম্যানেজার সায়েব দশটা রুপেয়া দিলি বখশিশ।

মরিয়ম হেসে বললে, হাঁ বাবু, খাদান আপিস হর-মাসে দু রুপেয়া বখশিশ দেয় ওঝারে।

কথা শেষ হতেই বুড়ি মনে পড়িয়ে দিলো, আর মাঝিনদের কথাটো।

—হুঁ। মারাং গাড়ায় সিবার মাছ মিললো না। সান্তালরা ভাবলো বটে পাপ হইছে, তাই মাছ মিলছেক না। তো আমি কইলাম...

ওষুধটা তৈরী হয়ে গিয়েছিল, নিয়ে বললাম, আজ উঠি, সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আবার আসবো।

লাটুয়া প্রথমটা অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। তারপর ঘাড় নেড়ে বললে, হুঁ, তিন দিন বাদে নূতন মূল দিব কত্তা।

বাইরে বেরিয়ে এলাম, সুরমণিও এলো।

আগের মতই হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, সুরমণি, কি করে চলে বল তো তোদের? আর কেউ আসে ওষুধ নিতে?

মাথা নাড়লো সুরমণি। চোখে মুখেও কেমন যেন বিষণ্ণতার ছাপ পড়লো তার। না, কেউ আসে না আর লাটুয়া ওঝার কাছে।

—তবে?

চোখ ছলছল করে উঠলো সুরমণির।

বললে, আধা বিঘান ক্ষেতি আছে, আমি আর জংলো চাষ কইর‍্যা চালাই বাবু।

লজ্জার হাসি হাসলো সুরমণি। আর কৌতুকে হেসে উঠলো মরিয়ম। বোঝালে, জংলোর সঙ্গে নেপা মিলানা হয়েছে ওর। পীরিত হয়েছে।

সুরমণি লাজুক হেসে বললে, হুঁ ঠিগিয়াটোও হ'য়েছে বাবু।

অর্থাৎ বাপলাও ঠিকঠাক। তাই দুজনে মিলে চাষ করে, আর সেই অন্নেই লাটুয়া আর লাটুয়ার বুড়ির দিনগুজরান হয়।

বললাম, লাটুয়া এত বড়ো ওঝা, ওর কাছে আসে না কেন সান্তাল রুগীরা?

শুনে চোখ ছলছল করে উঠলো ওর।

তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললো সুরমণি। বললে, তুই ডাক্তারের কাছে যা বাবু, ডাক্তারের কাছে যা। ই দাওয়াতে কাম হবেক নাই তুর।

বলে আমার হাতখানা চেপে ধরে টাকা দুটো ফেরত দিতে চাইলো সুরমণি।

বললে, ইটা ফিরায়ে লে বাবু, কাম হবে না তুয়ার, ই দাওয়াই মিছা বটে।

সুরমণি হঠাৎ যে এমন কথা বলতে পারে ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

টাকা দুটো দিতে চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই নিলো না ও।

বললে, আমার পাপ হবেরে বাবু, ই রুপেয়া দুটো তু ফিরিয়ে লে।

তারপর একে একে সব কথা বলে গেল সুরমণি। এতদিনের গোপন কাহিনীটা সহানুভূতির ছোঁয়াচ পেয়ে প্রকাশ করে ফেললো।

সব ছিলো লাটুয়া ওঝার। সব রোগের ওষুধ জানতো ও। ডাইনী যুগিন তাড়াতে পারতো, সাপের বিষ ঝাড়তে পারতো। নাগবংশীর পুজো দিয়ে সব শিখেছিল লাটুয়া ওঝা।

তারপর বুড়ো বয়সে জঙ্গলে মূল খুঁজতে খুঁজতে নাকি রাত হয়ে গেল একদিন।

পাগলের মত ও তখনও একা একা কি একটা গাছের মূল খুঁজছে।

খেয়াল করে নি, কখন একটা ভালুক পিছন থেকে এসে জাপটে ধরেছে ওকে।

জান বেঁচে গেল, কিন্তু ভালুকের থাবার ঘায়ে চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেল লাটুয়ার।

তখন থেকে আর ঘরের বাইরে যায় না ও। কিন্তু গাছের মূল তো আর চিরকাল থাকে না, কবে শেষ হয়ে গেছে সে সব ওষুধ। আর সে সব গাছের নামও জানে না কেউ, চেনেও না।

বুড়ো বাপ দুঃখ পাবে বলে আজেবাজে যা পেয়েছে ঘাস পাতা শিকড় নিয়ে এসে কৌটোগুলোয় সাজিয়ে রেখেছে সুরমণি।

রুগী না এলেও রোজ বসে বসে গল্প করে লাটুয়া, কোন ওষুধে কি কাজ হয়, কোনটা কাকে দিয়েছিল। আর ভাবে, ওর কাছে শুনে শুনে সুরমণিও বড়ো ওঝানী হয়ে উঠবে।

কিন্তু লাটুয়া তো জানে না যে সে মূল শেষ হয়ে গেছে। জানে না, চোখ ফিরে পেয়ে গাছগুলো চিনিয়ে না দিলে সুরমণি কিছুই শিখতে পারবে না। তাই দিনের পর দিন শুধু গল্প শোনে সুরমণি। আর গল্প শুনতে শুনতে চোখ ঠেলে কান্না আসে ওর।

তাই রুগীরাও কেউ আসে না আর, লাটুয়া ওঝার ওষুধে কাজ হয় না বলে ডাক্তারের কাছে ছুটে যায়।

সব কথা খুলে বললো সুরমণি।

বললে, তু ডাঁক্তারের কাছে যায়ে দাওয়াই নিবি বাবু. ই মূল লাগায়ে কাজ হবে নাই।

দীর্ঘশ্বাস লুকোতে পারলাম না। দেখলাম দু-চোখ চকচক করছে মরিয়মেরও।

মরিয়ম ফিরে আসার পথে বললে, মেন্ছায়েবকে বলে জংলোর একটা কাম ঠিক করে দে বাবু। কাম না পেলে উরা বাঁচবে নাই। লাটুয়া ওঝার মায়াটা মরবে, বুড়িটো মরবে, লাটুয়াও বাঁচবে নাই!

কিন্তু লাটুয়া কি সত্যিই বেঁচে আছে? ফিরে আসতে আসতে বার বার প্রশ্ন জাগলো মনে।

[১৩৫৯]

আদিম কন্যা

ছায়া ছায়া গলির মোড়ে তখনো গ্যাসবাতিটা জ্বলে ওঠে নি। আলো-জ্বালানে লোকটা কাঁধের মই নামিয়ে থেমেছে আরো দূরের ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে।

শহর গোধূলির ধোঁয়া-ধোঁয়া সাঁঝ-আঁধারের বাতাসে ভাসে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ময়দার আঠা আর কাঁচা ডিমের মত গন্ধ আসছে কাগজের স্তূপ থেকে। গলির দু-পাশের ঘর থেকে দু-একটা টুকটাক আওয়াজ, ভাঙা কথার রেশ। ওপাশের রকে বসে চা ফিরি করছে লোকটা। লোহার উনোনে বসানো কলসী থেকে এনামেলের মগে চা ঢেলে দিচ্ছে।

সুলেমানদের ঘরের সামনে একটা ফিটন। বোরখায় সারা অঙ্গ ঢেকে কে যেন নামলো, সরাসরি গিয়ে ঢুকলো অন্দরে। পিছনে কচি বয়সের মেয়েটা। মাথায় উঠেছে একটু, একটু বা মোটা। আর চোখে ফুটেছে পিপাসা। প্রথম চোখেই দেখে চিনলে ইসমাইল। আর রাবেয়াও চোরা চাউনিতে এপাশ-ওপাশ দেখে নিচ্ছিল। ইসমাইলের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ঝুপ করে ফেলে দিলো বোরখাটা। তারপর মায়ের পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকলো।

মগের চা চোখে দেখলো না ইসমাইল, কম দিলো কি বেশি। একটু তরু পায়েই ফিরে এলো দপ্তরিখানায়।

খবরটা দিলে সবাইকে।—সাকিনাবিবি ফিরে এলো। ছোট্ট আধো-অন্ধকার ঘরের গুমোটে হঠাৎ যেন এক দমকা তাজা বাতাস খেলে গেলো। একফালি চিকচিকে আলোর রোশনাই। কেউ বা ফর্মা ভাঁজছিল, কেউ বা ফুঁড়ছিল জেলের সুতি। জুসের জমিতে ছুঁচ ফুটলো না, ছাঁটাই মেসিনের হাতল ঘুরলো না আর।

ওরা জন বারো লোক।

—এলো?

—হাঁ। সাকিনাবিবি আর রাবেয়া।

ওদিকে কে হাতের গঁদ মুছে রেখেছিলো, বাবুজান তাড়া দিলো,

তো কি, কাজকাম বন্দ রইবে?

দম নিয়ে কাজ শুরু হলো আবার। ঘোর কাটলো আর সঙ্গেসঙ্গে শুরু হলো চোখাচোখি কথা। হাসি, ইশারা, ইঙ্গিত।

বাঁধা বইয়ের ছাঁট দেয়া শেষ করে বাবুজান বললে, জল্দি হাত চালাও, রাত দশটা নাগাদ ডেলিভারি দিতে হবে না?

হাত তো চলছেই, জবাব দেবে কেন!

জবাবের আশাতেই হয়তো একটু অপেক্ষা করলে বাবুজান। তারপর বললে, পানি খেয়ে আসি।

ইসমাইল হাসলে। আর সকলেও।

ওদিক থেকে কে ফোড়ন কাটলে, পিয়াস পানির না—পিয়ারীর?

দ্বিতীয় দফাতেও সেই এক ফল হলো। লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরতে হলো সাকিনাবিবিকে। তালাক নিয়ে। প্রথম দফায় সাত মাসের মধ্যেই হয়েছিল বিবি থেকে বেওয়া। রাবেয়াকে তবু কোলে পেয়েছিল। বারো বছর পরে ইজ্জত খুইয়ে বিয়ে করলে—হ্যাঁ ইমানদার মাশুকই তো মনে হয়েছিলো তাকে—কিন্তু দুটো বছরও কাটলো না। বড় ভাই সুলেমানের কাছে ফিরে এলো আবার।

ভাবীকে বললে, হামেদসাহেবের ছেলের সঙ্গে রাবেয়ার সাদি দোব না আমি। বলে দিয়েছি সে কথা।

সে কি! ফিরোজাবিবি আশ্চর্য না হয়ে পারলো না।—আলিমলোক হামেদসাহেব, কায়েমী ঘর!

সাকিনা বললে, না ভাবী, লক্ষ্ণৌয়ের লোক—এই তোমাকে ইশাদী রেখে বলছি, রাবেয়ার সাদি দোব না আমি সেও ভালো। কথা শেষ হলো না, কেঁদে ভেঙে পড়লো সাকিনা।

ফিরোজা তবু গায়ে মাখলে না কথাটা। লক্ষ্ণৌ আর আগ্রা—ও তো আগ্রার মেয়ে। বাঙালীঘরে নিজেকে বেশ তো মানিয়ে নিয়েছে ও।

কাঁদতে দিলো ফিরোজা, তুলে ধরলে না সাকিনাকে, সান্ত্বনা দিলো না। অনেক পরে বললে, বাবুজান আজকাল খুব বড়ো কারবারী হয়ে উঠেছে, জানো? তিনটে কুঠি নিয়েছে, বারো-চোদ্দটা লোক খাটে।

সাকিনার উত্তর না পেয়ে আবার বলে, রাবেয়া তো ওর কাছে আসমানের চাঁদ, পেলেই লুফে নেয়।

—উঁ হুঁ। সাকিনা মাথা নাড়ে।—তিনটে বিবি ওর ঘরে।

—তো কি ঐ কসবীগুলোর সঙ্গে এক কদর হবে নাকি রাবেয়ার? গুল আর গোলাপ এক কিস্মত? চাঁদ আর চেরাগ এক জলুস?

সুলেমানও সেই কথাই বলে। বাবুজানের চেয়ে ভালো পাত্র কোথায় আর? আর অমন জোয়ান চেহারা ক-জনেরই বা আছে।

সাকিনা উত্তর দেয়, রাবেয়া আমার বাচ্চা মেয়ে।

—বাবুজানের ওমরটাই বা কি এমন বেশী?

সাকিনা উত্তর দেয় না। অর্থাৎ রাজী নয়।

সুলেমান এদিকে বাবুজানকে বলে, ঘাবড়াও কেন! সবুর করো, সবুর করো।

—না, মানে ইসমাইলটা আবার বাচ্চা বয়েস থেকে একসঙ্গে খেলা-ধুলো করেছে রাবেয়ার সঙ্গে, কবে কি করে বসে।

সুলেমান হাসে।—বাবুজান, আমার ঘরে আলো ঢুকতে পায় না। আর রাবেয়াকে চেনো না তুমি। ভাবছো কেন. দুদিন সবুর করো।

বাবুজান বলে, আচ্ছা। কিন্তু সবুর করতে করতে চুলে কলপ লাগাবার দিন না এসে যায়।

সুলেমন হাসে।—আরে তুমি তো কাঁচ্চা জোয়ান এখনো?

এ ও তা পাঁচ কথার পর সুলেমান বলে, তা আমার ঐ ছাঁটাই মেসিনটার কি করলে? দাও না একটা কিনে, মাসে মাসে দশ কিস্তিতে শোধ করে দোব।

বাবুজান বলে, কারবার বাড়ছে, একসঙ্গে হাজার টাকা দেয়া! তা দোব দোব আর মাস কয়েক পরে। সবুর কর একটু।

সুলেমান বুঝতে পারে। মনে মনে বলে, বেইমান। মুখে বাবুজানকে নয়, বিবি ফিরোজাকে বলে, সাকিনাকে বলে দাও রাবেয়ার সাদি দেবে কি না ও। আমারও একটা ইজ্জত আছে, সাকিনার আক্কেল না থাকতে পারে। আখেরে আফসোস করতে হবে।

ফিরোজা বলে, আমাদের আরজি ওর কানে পেঁছয় না।

—কিন্তু লোকে যে বদনাম রটায় তা আমার কানে পেঁছয়।

পুরোনো কাঁচামাটির বাড়ি সুলেমানের। বাবুজানের মত পাকা দালান ভাড়া নেবার টাকা নেই ওর। তাই জল আনতে যেতে হয় তিনটে বস্তির ঘর ডিঙিয়ে। কাছেই রাস্তার মোড়ে আছে সরকারী জলকল। কিন্তু রাবেয়া বড়ো হয়েছে, নেই সে আগের দিনের কিশোরী

বয়েস। আর বিয়েরও চলছে কথাবার্তা, আজ না হোক দুদিন পরেও তো হবে। পাড়াপড়শীর কে কি খুঁত ধরবে, দরকার কি মোড়ের কলে জল আনতে যাওয়ার। তার চেয়ে আজম চাচার টিউবওয়েল ভাল। বুড়ো আজম চাচার বাড়ীতে মরদ তো নেই কেউ।

তা না থাক সুলেমানের চোখ এড়িয়ে বাঁশের চিকবেড়ার আড়ালে এসে হাজির হয় ইসমাইল। আজম চাচার চোখে ছানি, চোখ ঝাপসা।

—কি রাবেয়া, বাবুজানকে মনে লাগলো নাকি? শুনছি তুমি নাকি মত দিয়েছো সাদির লেগে?

রাবেয়া টুকরিয়ে হাসে। চোখের ফাঁকে ঝিলিক ছিটিয়ে বলে, আ কথা। দিনেরাতে ঐ এক দুঃস্বপন লেগেই আছে নাকি আঁখির কোণে?

—তা। তোমার মতো দিল্ জখম করার জাদুতো মাখাই না, না সুর্মা।

ফিক্‌ফিক্ করে হাসে রাবেয়া। একটু ছেলেমানুষি, একটু সুখ উৎসুক। বলে, কবিয়ালের মত কথা কও যে, রোবাই বাঁধছো নাকি?

এপাশে ওপাশে চিকের আড়াল, শুধু চট করে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে ওপরের বারান্দাটা। না কেউ নেই। সবে কলসীটা নামিয়ে রেখেছে রাবেয়া, আর ঝট্ করে তার হাত ধরে একটান মারলে ইসমাইল। তাল সামলাতে না পেরে ওর বুকের ওপর এসে পড়েছিল রাবেয়া. নিজকে সামলে নিয়ে বললে, কি করো!

ইসমাইল হেসে আরো কাছে টানতে চায় ওকে।

রাবেয়া কপট ক্রোধে বলে, শরম লাগে না তোমার? যাও আপন কাজে যাও। এখানে কেন?

ইসমাইল হেসে বলে, যাই। কাজে নয়, সুলেমান সাহেবের কাছে। বলবো, রাবেয়ার সাথে আমার সাদি দাও, আর, নয়তো ভাগবো আমরা দুজনে।

রাবেয়া ঠোঁট উল্টে বলে, ইস্। যার ঘর নাই. তার ঘরনী হবার সাধ নেই আমার। বাবুজানের মত দালান কোঠা আছে তোমার? বিয়ার দিনে আতশ জ্বালতে পারবে, কিংখাব কশীদার জামদানি দিতে পারবে বাবু-জানের মত? সানাই বাজাতে পারবে?

ইসমাইল বলে, বেগম ঘরে এলে বাদশা বনতে কি? সবুর কর দুদিন, দেখবে।

—হুঁ, একটা চাঁদির চুটকি দিতে পারে না, হীরে জহরত।

ইসমাইল বললে, সবুর করো না দুদিন।

মুখে সবুর করতে বললেও কাজে ইসমাইল রয়ে-সয়ে চলতে চায় না। সুলেমানের কাছে কথা পাড়ে। আর সাকিনাবিবির সঙ্গেও খুঁজে পেতে কি একটা সম্পর্ক বের করে বলে, রাবেয়াকে বিয়ে করবো।

সুলেমান বলে, পড়শীর সেরা সুরতের মেয়ে রাবেয়া, তোমার মত নালায়েকের সঙ্গে বিয়ে দেব আমি? রোজগার নেই একপয়সা—

সাকিনাবিবি কিন্তু মনে মনে পছন্দ করে বসে আছে ইসমাইলকে। আধা বুড়ো বাবুজানের চেয়ে ভাল। কপাটের আড়াল থেকে তাই সুলেমানকে বলে, ইসমাইলকে কও যে এ তো খুশীর কথা। ওর সঙ্গেই বিয়া দোব রাবেয়ার।

সুলেমান চটে যায়।—ঘর নাই কুঠি নাই। বেকার।

প্রতিবাদ আসে ভিতর থেকে।—উঠতি ওমর, খোদা দিলে বাবুজানের চেয়ে দশদফা বেশী রোজগার হবে।

মীমাংসা আর হয় না। ফিরে আসতে হয় ইসমাইলকে, সেই এক কথা শুনে, সবুর করো।

রাবেয়া অত বোকা মেয়ে নয়।

সুলেমান বোঝালে, মোহব্বতে মন ভরে, পেট ভরে না। কি আছে ইসমাইলের? বস্তির নোংরা ঘর একখানা। আর বাবুজান? বেগম-আদরে রাখবে। সোনা-চাঁদিতে মুড়ে দেবে রাবেয়াকে।

রাবেয়া বুঝলো কি বুঝলো না, কে জানে। কিন্তু না বললে না।

বিয়ে হয়ে গেল তার বাবুজানের সঙ্গেই।

বিয়েব পরেও বেশ খেয়াল খুশী। আর, আরো তিনটি বিবি থাকলে কি হবে, বাবুজান ওর প্রেমে পড়েছে। অমন টাকাওয়ালা লোক, আর বয়েসও কত! তবু, লোকটা যেন রাবেয়ার কথায় ওঠে আর বসে। যখন যা বলে, রাবেয়াকে খুশী করতে তর সয় না যেন। অথচ, আর তিনটে বিবি ভয়ে জড়োসড়ো। খাটছে বাঁদীর মত মুখ বুজে। আর জামিয়ার জামদানি, চুমকির চমক খেলে রাবেয়ার হাসির তালে। বাজু তাগা, কংকণ কানপাশা—কি দেয় নি রাবেয়াকে।

প্রথমবার স্বামীর ঘর থেকে যখন ফিরলো রাবেয়া, সাকিনাবিবি ভেবেছিল মেয়ের চোখে জল দেখবে। কিন্তু! খুশী হলো সাকিনা। মেয়ের মন বসেছে নতুন ঘরে। দিন-রাত কথায় কথায় ও বাড়ীর খবর।

—আম্মা! চাঁদির পেয়ালায় চা খাই আমি। রাবেয়া হাসে।

সাকিনা বলে, তোর তো বড়ো হয়রানি হবে এখানে। আমি তো সেই গরীবই।

রাবেয়া হেসে বলে, গরীব তো কি! আম্মা তো তুমি আমার। বলে মাকে জড়িয়ে ধরে। অর্থাৎ সুখের ভাগ দিতে চায়।

ওদিকে লণ্ঠন থেকে বিড়ি ধরিয়ে সুলেমান বলে, হুঁ হুঁ। অর্থাৎ বলি নি?

সাকিনা তৃপ্তিতে হাসে। রাবেয়া চলে যায় কাপড় বদলাতে। একটু পরেই এসে হাজির হয়, পিতলের কলসীটা কাঁখে নিয়ে।

সাকিনা বলে ওঠে, না না রাবেয়া। দামাদ বলবে, দুদিনের জন্যে পাঠিয়েছি বাঁদীর মত খাটিয়ে নিয়েছে তাকে।

—তো এই!

বুড়ো আঙ্গুলের কলা দেখিয়ে হেসে ছুটে পালায় রাবেয়া। বড়োলোকের বিবি বলে কি কাজ করতে পাবে না নাকি? দিনরাত বসে থাকবে আর পান চিবোবে? না শুধু নখে মেহেদি লাগাবে, চোখে সুর্মা! বাবুজান জানলে চটবে? চটুক। ইসমাইলও কি কম চটেছে নাকি? সত্যি, ইসমাইলকে বিয়ে করে কি এত সুখী হতে পারতো, না থাকতে পেত এত আরামে।

ইসমাইল অতশত ভেবে দেখে না। মেয়ে জাতটার ওপরই চটে গেছে ও। টুটা দিল কি জোড়া লাগবে আর? ও ভেবেছিল, সুলেমানের মত না থাক, সাকিনা বিবির তো মত আছে। আর তাও যদি না থাকতো রাবেয়ার মন পেয়েছিল যখন দুজনে অন্য কোথাও গিয়ে কি ডেরা বাঁধতে পারতো না?

রাবেয়া কি তা হলে সত্যি ওকে ভালবাসতো না? শুধু খেলা? কিন্তু। কিসের নেশায় ছুটে আসতো সে, জলের না যৌবনের। নিজের মনকে সমঝিয়েছে নানা ভবে, নিজের সান্ত্বনা নিজেই বানিয়েছে। মনে মনে ভেবেছে, রাবেয়া ওকেই ভালবাসে। সুলেমানের চালে পড়ে বিয়ে করেছে বাবুজানকে।

বাবুজানের দপ্তরীঘরে ঢুকতে বেরোতে চোখে পড়ে দোতলার জানালাটা। বুটিদার মলমলের রঙিন পর্দাটা নজর হয়। কখনো বা একটা নরম সাদা হাত বেরিয়ে আসে, জানালার শার্সি খোলে কেউ। জলতরঙ্গের মিহি বোলের মত কখনো বা শুনতে পায় রঙিন কাঁচের জলচুড়ির টুং-টাং।

ফাঁপা হাওয়ার মোচড় লাগে ইসমাইলের বুকে। তবু চোখ তুলে স্পষ্ট করে তাকাতে চায় না ও। যা ভেঙেছে তা ভুলেই যাওয়া ভাল। রাবেয়ার ওপর মাঝে মাঝে মনটা বিষিয়ে ওঠে। তবু ভাবতে ভাল লাগে রাবেয়া ওকেই ভালবাসতো।

না, ওর কাছে সেই বিয়ের আগের রাবেয়াই বেঁচে আছে। নিজের মনকে জোর করে বেঁধে রাখে। পরের বিবিকে ভাববে কেন? তেমন বেদরদ বেইমান নয় ও।

তাই, রাবেয়ার বিয়ের পর থেকে ও শুধু দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখেছে। রোমন্থন করেছে চোখের দৃষ্টিতে। চোখ তোলে নি রাবেয়ার খোঁজে।

রাবেয়া কিন্তু খুঁজেছে ওকে।

সোনার আব চাঁদির জলুসে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল রাবেয়ার। ওর আসমানে ছিল বাবুজান আর বাবুজান। ঝুটা মতির মালায় বেঁধেছিল টুটা মোহব্বতের আহজারী।

তারপর হঠাৎ একদিন বুকের চাপা দীর্ঘশ্বাসটা বেরিয়ে এলো। কিন্তু টের পেল না কেউ। সাকিনাবিবিও ভাবলে, মেয়ে সুখী হয়েছে। তা না হলে এত খুশখেয়ালের ঝিলিক কেন মেয়ের চোখে!

পিতলের কলসীটা আবার তুলে নিলে রাবেয়া। চিকের আড়ালে আড়ালে গেল আজম চাচার বাড়ী। আজম চাচার টিউবওয়েল থেকে জল আনতে।

যায় আর আসে। কলসীর পিঠে টোকা দিয়ে আওয়াজ তুলে। পড়শী মেয়েদের মস্করা শুনে হাসির হিল্লোল তোলে। তয়ফা তুরন্ত পায়ে নেচে নেচে যায় আর আসে। নরম হাতে কখনো কাচের জলচুড়ির আওয়াজ তোলে। কখনো কাঁকন কাঁচুলিতে জ্বালায় আশনায়ের আতিশ।

তবু ইসমাইলের দেখা মেলে না।

আওয়াজ কানে আসে ইসমাইলের। হাসিনা হাসির ছোঁয়া পায়। চোখ বুজে খাটিয়ায় পড়ে থাকে ও, বালিসে মুখ গুঁজে। উঠতে ইচ্ছা হয় না।

সেদিনও শুয়ে শুয়ে ভাবছিল ও। কি ভাবছিল? কে জানে। কিছু না, কিছু না।

বাইরে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ভাঙা মসজিদের আড়ালে লুকিয়ে আফতাব। আফসোসি আজান থেমে গেছে।

হঠাৎ পিঠের ওপর একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে চমকে চোখ তুললে ও।

রাবেয়া।

রাবেয়া বদলে গেছে। ইসমাইল দেখে।

চোখ গভীর, বুকে পিয়াস। বর্ষার কবুতরের মত রাবেয়ার সারা দেহ ফুটে উঠেছে, পাখা মেলেছে যেন গুলবাহার বাগিচা। কামনাতুর আশ্লেষে ভেঙে পড়তে চাইলো রাবেয়া।

কিন্তু রাবেয়ার আলিঙ্গন-আকাঙ্ক্ষী হাত দু-খানা সরিয়ে দিলে ইসমাইল।

শ্লেষের হাসি মাখিয়ে বললে, মাতোয়ালীর মতো আদব দেখাও যে! ফিরে যাও রাবেয়া, তুমি বাবুজানের বিবি। আমার কাছে বেগানা জেনানা।

আহত সাপিনীর মত চোখের দৃষ্টিতে বিষ ছড়ালে রাবেয়া।

বললে, মুনিবকে ডর পাও বুঝি?

—নিমকহারাম নই আমি।

—আর আমার মোহব্বতের ইনাম বুঝি এই?

ইসমাইল হাসলে।—মোহব্বৎ আর আশনাই এক নয়।

রাবেয়া তবু এগিয়ে এলো।

ইসমাইল বললে, ফিরে যাও রাবেয়া। আর নয়তো বাবুজানকে ছেড়ে চলে এসো। তোমার জন্যে জান দিতে পারি আমি, জাল্লু মোহব্বতের জন্যে নয়। তুমি ফিরে যাও।

রাবেয়া তবু নড়লো না।

ইসমাইল উঠে এলো। রাবেয়ার হাত ধরে ওকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে বললে, আজ যাও রবেয়া। তোমার মোহব্বৎ যদি সাচ্চা হয়, গিয়ে বলে ফেল বাবুজানকে। তালাক নিয়ে এসো, তোমাকে নিকা করে চলে যাবো আমরা এখান থেকে। যাও।

ব্যর্থতায় নুয়ে পড়লো রাবেয়া। ইসমাইলের কাছ থেকে এমন আঘাত পাবে বুঝতে পারে নি। তা হলে! ওর মদো রক্তে বিষাক্ত হাসি খেলে গেল। নিকা? কি অছে ইসমাইলের? না চাঁদি, না চুমকি।

তর্‌তর্‌ করে হেঁটে চললো ও। রাগে জ্বলে উঠলো দু-চোখ। অন্ধকার রাতের রাস্তায় গ্যাসবাতির ছায়ায় দুলতে দুলতে এসে থামলো বাবুজানের বাড়ীর সামনে।

বাবুজানের কোলে মাথা রেখে কেঁদে উঠলো রাবেয়া।

আশ্চর্য! হঠাৎ ফিরে এলো কেন রাবেয়া? সাঁকিনাবিবি কি ওকে

কিছু বলেছে। না সুলেমান তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে?

—কি হয়েছে রাবেয়া?

রাবেয়া আবার কেঁদে উঠলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো।

বললে, ঐ বেয়াদবটা—ঐ চশমখোর, বেইমান ইসমাইল বেইজ্জত করেছে আমাকে। হাত ধরে টেনেছে ও আমার। আবার কেঁদে মুখ লুকোলো রাবেয়া।

স্বস্তির নিশ্বাস নিলো বাবুজান। তাপযন্ত্রের পারা নেমে গেল রবেয়ার মন থেকে। একি ভুল করে ফেলল ও!

বাবুজান বললে, সবুর করো বিবিজান, ও আহম্মকের বন্দোবস্ত করছি।

বাবুজানের দিকে তাকিয়ে ওর হাতটা আঁকড়ে ধরে রইলো রাবেয়া। মুখে ভয়ের হাসি।

[১৩৫৬]

যুবতী ধরম

এক একজনের চেহারার মধ্যে এমন কিছু থাকে যার ফলে একবার দেখলেই মনে দাগ কাটে, ভোলা যায় না। অন্ধকারের মধ্যেও তাই চিনতে পারলাম।

রাত তখন ঘন হয়ে আসছে। পার্কে যারা সান্ধ্যভ্রমণের নামে চিনেবাদাম চিবোতে আসে তারা তখন ফিরতি মুখে। যুবকমন যাদের দেখে ঈর্ষা বা উল্লাস প্রকাশ করে সেই সব সুখী দম্পতিরাও তখন পরিবারের অনুপস্থিত আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে যাবতীয় দ্বিধা দ্বেষ দ্বন্দ্ব উদ্গীরণ করে পুনরায় ধোঁয়াটে মন নিয়ে বাসায় ফিরে চলেছে। এ সময়টায় পার্কের ঘাসে কিংবা কাঠের বেঞ্চিতে লোকজন খুবই কম দেখা যায়।

বেঞ্চিটা দূর থেকে মনে হয়েছিল খালি আছে। কাছে আসতেই টের পেলাম কে যেন বসে রয়েছে। পিঠ দেবার জায়গাটায় হাত রেখে এবং হাতের ওপর মাথা রেখে যে বসেছিল, প্রথমটা মনে হয়েছিল সে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধীর ধীরে তাই এক পাশে, একটু দূরত্ব রেখেই বসে পড়লাম। সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে লোকটা। আহা ঘুমোক! পাছে ঘুম ভেঙে যায় তার, এই ভয়ে, দেশলাই জ্বালবো কিনা সিগারেট ধরাবার জন্যে, ভাবছিলাম।

হঠাৎ চমকে উঠলাম।

মনে হলো, ভদ্রলোক যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। কান পেতে শুনলাম। হ্যাঁ, কান্না। নিশ্বাসের শব্দেই কেমন যেন কান্নার আভাস।

চুপ করে বসে রইলাম। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, উঠে পালাতে পারলেই যেন ভালো হয়। একবার আড়চোখে তাকালাম তাঁর দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে আমাকে একবার দেখে নিয়েই আবার হাতে মুখ গুঁজলেন ভদ্রলোক।

বলেছি না, এক একজনের চেহারার মধ্যে এমন কিছু থাকে, যে একবার দেখলেই মনে দাগ কাটে, অন্ধকারেও চিনতে অসুবিধে হয় না।

মুখ তুলে মুহূর্তের জন্যে তিনি তাকালেন আমার দিকে, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল সেদিনের দৃশ্যটা।

কেমন যেন রহস্য রহস্য ঠেকলো। প্রায় ছ-ফুট লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা, বয়সে প্রৌঢ়ই বলা চলে, বসন্তের দাগ থাকলেও সুশ্রী বলা যায় এমন ধরনেব মুখশ্রী। কিন্তু এমন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ চেহারার মানুষ যে কাঁদতে পারে, বিশেষ করে পার্কের নির্জন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে, তা কোনদিন কল্পনাও করি নি। বরং প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল ওঁর মত সুখী মানুষ বুঝি ভূভারতে নেই।

দুপুরবেলায় আপিস থেকে বেরিয়েছি এক বন্ধুর সঙ্গে, কাছের ইস্কুলটায় বন্ধুপুত্রের জন্যে একটা সীটের ব্যবস্থা করার চেষ্টায়। ইস্কুলে তখন বোধহয় টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে। হৈ-হল্লা ছুটোছুটি করছে ছেলেগুলো সামনের রাস্তায়। হঠাৎ একখানা গাড়ি শব্দ করে এসে থামলো।

সঙ্গে সঙ্গে একদল বাচ্চা ছেলে ছুটে এলো গাড়িটার কাছে।

ফিবে তাকিয়ে দেখলাম, স্টিয়ারিং ছেড়ে গাড়ি থেকে নামলেন ভদ্রলোক। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ, কিন্তু তার মধ্যে কোথায় যেন অফুরন্ত হাসি লুকিয়ে ছিল।

গাড়ি থেকে নেমেই পকেট থেকে রুমালটা বেব করে কপাল মুছলেন তিনি, তারপর রুমালটা পাদানিব ওপর বিছিয়ে বসে পড়লেন। একরাশ ছেলে তখন ঘিরে ধরেছে তাঁকে।

তিনিও হাসতে হাসতে কি যেন বলছেন।

কাজ সেরে ইস্কুলের আপিসঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখনও তিনি গল্প করতে করতে বাঁ হাতের কৌটো থেকে টফি বের করে বিলি করছেন।

থামতে হলো। কোলকাতা শহরে এমন দৃশ্য তো দেখা যায় না। পকেটের পয়সায় টফি কিনে অপরের ছেলেকে খুশী করছেন—এ কেমন ধারার নির্বুদ্ধিতা।

ভদ্রলোক ততক্ষণে ম্যাজিক দেখাতে শুরু কবেছেন। হাতের তাস উধাও করা, টফির টিনটা তখনই খালি, তখনই টাকায় ভর্তি, রুমালের রঙ লাল থেকে সবুজ, সবুজ থেকে সাদা—এমনি নানান কলাকৌশল দেখিয়ে একসময় উঠলেন তিনি।

যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন টিফিন-শেষের ঘণ্টা পড়তেই।

কিন্তু ছেলের দল তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ না গাড়িটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেদিন সত্যিই রহস্যজনক মনে হয়েছিল তাঁর ব্যবহার। মনে হয়েছিল মানুষ খুব বেশি সুখ এবং সচ্ছলতার মধ্যে বোধহয় স্বার্থশূন্য হয়ে অপরকেও খুশী করতে চায়।

তখন তো জানতাম না।

জানতাম না, সেই মানুষ কিনা অন্ধকারে পার্কের বেঞ্চিতে বসে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

অথচ কেন এই নিঃশব্দ কান্না তার হদিস খুঁজে পেলাম না।

তবু চুপচাপ বসে রইলাম। উঠে যেতেও মন চাইলো না।

খানিক পরেই মুখ তুলে সোজা হয়ে বসলেন ভদ্রলোক। সহজ হয়ে। আমার দিকে দু-একবার ফিরে তাকিয়ে বোধহয় বোঝবার চেষ্টা করলেন, তাঁর গোপন কান্না আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিনা।

পার্কে বেড়াতে এসে কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়তো বসে থেকেছি কোন অপরিচিতের পাশে। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ করতে কথা বলতে ইচ্ছে হয় নি কোনদিন। এটা কোলকাতা শহর। একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসার অধিকার আছে, পাশের লোকের শান্তি ভঙ্গ করে এক মনে পাগলের প্রলাপ বকে গেলেও আপত্তি করা যাবে না, কিন্তু অপরিচিত লোকটির সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তা অভদ্রতা!

পার্কটা তখন রীতিমত নির্জন হয়ে উঠেছে। সামনের গাছটার ডালে পাখা ঝটপট করছে কয়েকটা পাখি। আর পার্কের চারপাশের গ্যাসবাতি-গুলোও কেমন যেন ম্লান বিষণ্ণ। শুধু ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল থেকে থেকে।

উঠবো কিনা ভাবছিলাম।

হঠাৎ ভদ্রলোক হাসলেন।

আশ্চর্য হয়েছেন, তাই না?

চমকে ফিরে তাকালাম।

বললাম, না না। আশ্চর্য হবো কেন?

উত্তর এলো, দোষ নেই আপনার। হঠাৎ পার্কে বসে বসে কাউকে কাঁদতে দেখলে আমিও হতাম।

সান্ত্বনা দেবার স্বরে বললাম, সকলের জীবনেই দুঃখ আছে।

হাসলেন ভদ্রলোক। অন্ধকারেও মনে হলো, সে যেন হাসি নয়, কান্নারই

নামান্তর। বললেন, ভগবান দুঃখ দিলে সহ্য করা যায়, কিন্তু......কথা শেষ হলোনা।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

আরেকদিন দেখা হবে।

একটা রহস্যের ছায়া যেন লম্বা লম্বা পা তুলে অন্ধকার থেকে আলোর ভিড়ে মিশে গেল। মনের মধ্যে জেগে রইলো একটা দুর্বোধ্য প্রশ্ন। সে-প্রশ্নের উত্তর না জেনে শান্তি নেই যেন, স্বস্তি নেই। ভেবেছিলাম, আর বুঝি দেখা হবে না কোনদিন। জানতে পারবো না, কি এমন দুঃখ গুমরে মরে এই বলিষ্ঠ শরীরের গোপন মনে।

কে জানতো টফি বিলি করার অভ্যাস তাঁর নিত্যদিনের। কে জানতো আবার দেখা হবে!

বন্ধুর ছেলেটিকে সেদিন বৃন্দাবন মিত্তিরের গলির ইস্কুলে ভরতি করতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল।

গাড়িটা ফটকের সামনে এসে দাঁড়াতেই নমস্কার করে বললাম, কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?

ভদ্রলোক মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, মাপ করবেন, ঠিক মনে পড়ছে না।

বললাম, পর্কের বেঞ্চিতে আলাপ হয়েছিল............

দু-হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা মুঠো করে ধরলেন ভদ্রলোক। —আপনি? আপনি যে কি উপকার করেছেন আমার............

উপকারটা যে কি বুঝতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। সেদিনও যারা ভিড় করে এলো, তাদের হাতে টফি দেওয়া শেষ করে বললেন, আজ আমার কাজ আছে, আজ আর ম্যাজিক দেখানো হবে না। কাল দেখাবো, কেমন?

বলেই আমাকে টেনে তুললেন গাড়িতে।

সার্কুলার রোডের ওপর একখানা বিরাট বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে নামলাম। দরজা খোলাই ছিল। তোয়ালে কাঁধে বেয়ারাটা বসবার ঘর খুলে দিতে গেল।

ভদ্রলোক বললেন, না রতন, ওপরেই বসবো।

মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরের শোবার ঘরে উঠে এলাম তাঁর পিছনে পিছনে।

ঘরে ঢুকেই দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ছ-সাত

বছরের ছোট্ট একটি ছেলে আর ন-দশ বছরের একটি মেয়ে। ভাইবোনে গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালজোড়া এত বড় অয়েল পেন্টিংটা দেখেই কেমন সন্দেহ হলো।

মনে হলো, ছেলেমেয়ে দুটির মৃত্যুই হয়তো ভদ্রলোকের দুঃখের মূল। আর সেইজন্যেই হয়তো বৃন্দাবন মিত্তিরের গলিতে ছুটে যান প্রতিদিন। শিশুর ভিড়ে নিজের দুঃখ ভোলার চেষ্টা করেন হয়তো।

একটা চেয়ার টেনে বসতে বললেন।

বসলাম। তারপর দেয়ালের চারপাশে তাকিয়ে আরেকখানা ছবি খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না।

ভদ্রলোক হঠাৎ অয়েল পেণ্টিংটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, আমার ছেলে আর মেয়ে। আচ্ছা, এদের দেখেছেন কোথাও?

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, সে কি, হারিয়ে গেছে নাকি?

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

বললেন, না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আপনি যে কি উপকার করেছেন আমার!

অপ্রতিভ হয়ে বললাম, বার বার এ-কথা কেন বলছেন, কোন উপকার তো আমি করি নি।

—করেছেন। আপনি জানেন না কি দুঃখের বোঝা বয়ে চলেছি আমি। আপনি সেদিন সান্ত্বনা না দিলে......

খানিক থেমে বললেন, সেদিন আমি আত্মহত্যা করতাম, আত্মহত্যার জন্যেই তৈরি করেছিলাম নিজেকে। সত্যি, এক-এক সময় মানুষ যে কত বোকা হয়ে যায়......

চুপ করে রইলাম। এ-কথার প্রসঙ্গে বলবার মত কথা খুঁজে পেলাম না।

দেরাজ থেকে একটা শিশি বের করলেন ভদ্রলোক। দেখিয়ে বললেন, আত্মহত্যাই করতাম, কিন্তু আপনার কথা শুনে জীবনের ওপর মায়া হলো, ভাবলাম......

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আয়নার টেবিলের দেরাজ খুলে একখানা অ্যালবাম নিয়ে এসে বসলেন।

—এই—আচ্ছা একে দেখেছেন কোথাও? দেখেন নি কখনও?

অ্যালবামটা হাতে নিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম ছবিটার দিকে।

অপরূপ এক সুন্দরীর ফটোগ্রাফ। কোলে একটি ছোট্ট শিশু, আর হাঁটু জড়িয়ে ধরে আছে একটি ছোট্ট মেয়ে, এমন রূপময়ী মাতৃমূর্তি চোখে পড়ে নি কখনো। শিশির ভেজা নিষ্কলঙ্ক একটি পদ্মের মত রূপ।

বলে দেওয়ার প্রয়োজন হলো না। বুঝলাম, ইনিই ভদ্রলোকের স্ত্রী।

অ্যালবামটা নিয়ে আবার পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, আমার স্ত্রীর ছবি, আমার ছেলে, মেয়ে।

বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভাবলাম, স্ত্রী হয়তো মারা গেছেন, তাই এমন হয়ে গেছেন উনি শোকে দুঃখে।

হঠাৎ মৃদু হাসি দেখা দিল ওঁর মুখে। কান্নার মতই দেখাল হাসিটা। বললেন, মেয়েদের মন...আপনি জানেন না, বারো বছর একসঙ্গে থেকেও কোনদিন বুঝতে পারি নি ও অসুখী ছিল। হঠাৎ একদিন বিকেলে কাজ থেকে ফিরে এলাম ক্লান্ত শরীর নিয়ে। আসবার সময় দু-খানা সিনেমার টিকিট কিনে এনেছিলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম, সমস্ত বাড়ি ফাঁকা। একটুকরো চিঠিও রেখে যায় নি সে। ভাবতে পারেন আপনি? বারো বছর ধরে যাকে ভালবেসে এসেছি, বারো বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও যার ভালবাসায় সন্দেহ করার কোন কিছু খুঁজে পাই নি, হঠাৎ এক সন্ধ্যায় ফিরে এসে যদি শোনেন সে চলে গেছে......

বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠল ভদ্রলোকের। ঘাম মোছার ভান করে রুমালে চোখ মুছলেন।

—প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তো বেড়াতে গেছে। কিংবা দোকানে কোন জিনিস কিনতে। চাকর দারোয়ান কেউ কিছু বলতে পারলো না। অপেক্ষা করে রইলাম সে-রাত্রি। পরের দিন আত্মীয়স্বজন চেনা-জানা সকলের কাছে চিঠি লিখলাম। তারপর, তারপর ভয় হলো, ভাবলাম......হ্যাঁ, পুলিসেও খবর দিলাম শেষকালে। হাসলেন ভদ্রলোক।

উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, খোঁজ পেলেন না?

—না। ছ মাস পরে একখানা চিঠি পেলাম শুধু। তিন লাইনের চিঠি। লিখেছে, 'যাকে ভালবাসতাম, ভালবাসি, তার সঙ্গেই চলে এসেছি। আমাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টায় নিজেকে কষ্ট দিও না।'

আহত বোধ করলাম। সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, সত্যি, মেয়েদের মন......

হাসলেন ভদ্রলোক। বিষণ্ণ হাসি। বললেন, দুঃখ তার জন্যে নয়। স্ত্রীর দুঃখ আমি ভুলতে পেরেছি। কিন্তু আমার ছেলেমেয়ে দুটি...

দু হাতের ওপর মাথা গুঁজে সশব্দে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ভদ্রলোক। আর সে কান্না দেখে আমার নিজের চোখও যেন ছলছল করে উঠল। বুকের ভেতর কেমন একটা দুঃসহ ব্যথা অনুভব করলাম।

চুপ করে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় মাথা তুললেন ভদ্রলোক। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সেদিন কেন কেঁদেছিলাম জানেন? যে স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে গেছে তার দুঃখে নয়, ছেলেমেয়ের জন্যেও নয়...

—তবে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

বললেন, সেদিনই প্রথম খোঁজ পেয়েছিলাম ওদের। জানতে পেরেছিলাম আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গেই চলে গেছে। খোঁজ পেয়েই ছুটতে ছুটতে গেলাম তার কাছে।

--তারপর?

—বললাম, আমি আর কিছু চাই না, শুধু ছেলেমেয়ে দুটিকে দাও। ওরা আমার সন্তান, আমি মানুষ করবো ওদের।

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললেন, যে স্ত্রীকে বারো বছর ধরে ভালবেসে এসেছি, যার ভালবাসায় কোনদিন সন্দেহ করি নি, তার চোখে সেদিন যে ঘৃণার দৃষ্টি দেখলাম, সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ও ভাবলে, বুঝি ওকেই ফিরিয়ে আনতে চাই। তাই পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো, বললে, 'আইনের জোরে নিয়ে যেতে চাও আমাকে? কিন্তু জেনে রাখো তা তুমি পারবে না। তার আগেই আত্মহত্যা করবো আমি, তবু তোমার কাছে ফিরে যেতে পারবো না।' হাসলাম তার কথা শুনে, ছেলেমেয়ে দুটিকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে গেলাম, তারা ভয়ে মায়ের আঁচল জড়িয়ে রইল, কিছুতেই আসতে চাইলো না। আপনিই বলুন, তারপরও আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হবে না?

উত্তর দিতে পারলাম না। কি উত্তর দেব এ-কথার! কি সান্ত্বনা দেব এ দীর্ঘশ্বাসের।

ভদ্রলোক হাসলেন, বোধ হয় আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করেই।

বললেন, আপনি যেচে সেদিন সান্ত্বনা না দিলে হয়তো আত্মহত্যাই করতাম। কিন্তু তারপরই মনে হলো, এভাবে নিজেকে ধ্বংস করে লাভ নেই। প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি জেগে উঠলো মনে। ভাবলাম, ও যেমন

আমার জীবন নষ্ট করেছে, ওকেও তেমনি সুখী হতে দেবো না। সেদিন আমার স্ত্রীকে সামনে পেলে আমি খুন করতাম। এমন কি ছেলেমেয়ে দুটোকেও...

বললাম, খুন করে বসলেও দোষ দিতাম না আপনার।

হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, কিন্তু তার আর প্রয়োজন হবে না।

প্রয়োজন হবে না? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালেন। পরক্ষণেই হঠাৎ সচেতন হয়ে আমার দিকে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিলেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, বন্ধুদের পরামর্শে কোর্টে মামলা করলাম। বললাম, স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাই না, চাই শুধু আমার ছেলে মেয়ে দুটিকে। আইন আমার পক্ষে, ওরাও জানে আমার ছেলে আর মেয়েকে আমি ফিরে পাবো। তাই।—

পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। একটুকরো কাগজ বের করলেন।

হাসতে হাসতে বললেন সতী-সাধ্বী স্ত্রীর চিঠি। লিখেছে, ছেলে-মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবে না ও! লিখেছে, ওর সব দোষ ক্ষমা করে আমি যেন ওকেও ফিরিয়ে নিই। বলে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

বললাম, মুহূর্তের ভুলের জন্যে তাঁর সমস্ত জীবনটা নষ্ট করবেন না। তাকে ফিরিয়ে আনুন আপনি।

ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, না, কক্ষণো না। তা হতে পারে না। ওকে আমি শাস্তি দিতে চাই, সমস্ত জীবন তার দুঃখময় করে তুলতে চাই আমি। আপনি জানেন না, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভোলা যায়, প্রেম ভালবাসা মুছে ফেলা যায় মন থেকে, কিন্তু সন্তান-স্নেহ যে কি, না হারালে বুঝবেন না। তাকে শিক্ষা দিতে চাই...

বলে স্থির হয়ে বসলেন ভদ্রলোক। তারপর স্ত্রীর চিঠিটা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন।

আর একটা নিঃশব্দ নিশ্চুপ অস্বস্তির মধ্যে বসে থাকতে হলো আমাকে। তাবপর এক সময় বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আসবার সময় শুধু বললেন, আবার আসবেন।

বললাম, আসবো।

কিন্তু মনে মনে জানতাম, এ অস্বস্তিকর পরিবেশে স্বেচ্ছায় আর কোনদিনই আসবো না।

যাইও নি আর কোনদিন।

জানি না তারপর কি ঘটেছে। জানি না স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনেছেন কি না। কিন্তু এটুকু জানি, ছেলে আর মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না তাঁর স্ত্রী। এ অসহ্য অতৃপ্তির চেয়ে হয়তো বা আত্মহত্যাই বরণ করবেন।

যে যাই বলুক, যৌবনের ক্ষণিক মোহে পথ হারালেও যৌবনের ধর্ম হলো সন্তান-স্নেহ।

বহুবার ইচ্ছে হয়েছে এই বিচিত্র ভদ্রলোকটির জীবন নিয়ে গল্প লিখতে। সামান্য একটু কল্পনার রঙ মেশালে হয়তো ভালো গল্পও একটা লেখা যায়। কিন্তু অসত্যের কালিমা মাখিয়ে তাঁর চরিত্রকে বিকৃত করতে ইচ্ছে হয় না, সাহিত্যের খাতিরেও না।

[১৩৬২]

ম ন ব ন্দী

তাঁর পুরো নামটা জানবার সৌভাগ্য হয় নি কোনদিন। শুধু এইটুকু জানি যে, তখন তিনি কুমারী ছিলেন, উপাধি ছিল 'সেন'। পরে শ্রীমতী হয়েছিলেন, উপাধি হয়েছিল ভট্টাচার্য। প্রথম দেখেছিলাম ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেসের থার্ড ক্লাস কামরায়। রাতের ট্রেনে কখন কোন্ স্টেশন থেকে যে উঠেছিলেন লক্ষ্য করি নি। লক্ষ্য করবার উপায়ও ছিল না।

পুজোর ভিড় তখন। থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে যদিও লেখা ছিল 'বত্রিশ জন বসিবেক', তবু জনপঞ্চাশেক লোক ঢুকেছিল কামরায়। আর যত না যাত্রী, তার পাঁচগুণ ছিল বাক্স-বিছানা, লটবহর, খাবারের চ্যাঙাড়ি, মাটির কুঁজো, নতুন কুলো, ছাতা, লাঠি। নীচের বেঞ্চি, উপরের বাঙ্ক থেকে বাড়তি ভিড়টা উথলে এসে পড়েছিল দরোজার কাছে। তারই মধ্যে দরোজার জানালায় মাথা গলিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম আমি, আর আমার এক মুসলমান বন্ধু।

মাঝে মাঝে জানালায় মাথা গলাই, আর মাঝে মাঝে কচ্ছপের মত সুড়ুৎ করে গলাটা টেনে নিয়ে শিরদাঁড়ার টনটনে ব্যথা ভাঙাই। আর তারই ফাঁকে দু-একটা আজেবাজে কথা চলে বন্ধুটির সঙ্গে।

এমন সময় হঠাৎ বন্ধুটি ফিসফিস করে বললে, ভদ্রমহিলা বোধ হয় কিছু বলতে চান—তোমাকে।

ভদ্রমহিলা? ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। বেঞ্চির এককোণে ইঞ্চি ছয়েক জায়গায় কোনরকমে ব্যালান্স রক্ষা করে বসে আছেন একজন ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলা বলব, না তরুণী? একহারা লম্বা ছিপছিপে চেহারা, বয়স হয়তো ছাব্বিশ। কিন্তু এই বয়সেই চোখেমুখে ছত্রিশ বছরের ক্লান্তি।

শরীর সম্পর্কে কোন যত্ন না নিলে এবং অত্যধিক দুশ্চিন্তায় মুখের চামড়ায় যেমন এক ধরনের খসখসে ভাব ফোটে, তরুণীটির মুখেও সেই ছাপ দেখলাম। দুহাতে একরাশ জিনিসপত্তর। একটা ছোট এ্যাটাচি কেস, আরও কী কী যেন জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন তিনি। আর চোখজোড়া কি যেন বলতে চাইছিল।

বার তিনেক চোখাচোখি হওয়ায় হঠাৎ বললেন, শুনুন।

এগিয়ে গেলাম।

—আপনি তো বাঙালী?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? উষ্মা প্রকাশ পেলো এবার।

বললাম, কেন বলুন তো?

—বাঃ দেখতে পাচ্ছেন না কত অসুবিধে হচ্ছে? এভাবে কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারে?

মনে মনে ভাবলাম, কি আশ্চর্য, এই ভিড়ের মধ্যে যে বসবার জায়গা পেয়েছেন এইতো যথেষ্ট। আর আমি নিজেই যখন এত কষ্ট সহ্য করে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তখন অপরের সুখসুবিধের দিকে চোখ না গেলেই বা কি অন্যায়। সারা গাড়িতে আর কেউ বাঙালী নেই বলেই কি সব দায়িত্ব আমার নাকি!

তবু সুর নামিয়ে বললাম, কি করব বলুন।

বিরক্তির স্বরে উত্তর এল, কেন ঐ যে ওদিকের বেঞ্চে হাত-পা ছড়িয়ে সংসার পাতিয়ে বসেছেন ওঁরা, ওঁদের তো একটু বলতে পারেন।

তাকিয়ে দেখলাম কথাটা মিথ্যে নয়। ট্রেন ছাড়বার মুহূর্তে ওদিকটা একেবারে ভিড়ে ঠাসা ছিল, তারপর দু-একজন নেমে গেছে, অথচ তাদের জায়গাগুলো দিব্যি দখল করে বসেছে মোটা চেহারার মাড়োয়ারী গিন্নীটি, নথ নেড়ে নেড়ে গল্প জমিয়ে তুলেছে, ছেলেমেয়েগুলোও।

হাজার হোক স্বদেশবাসী, তাই অনেক কাকুতি-মিনতি করে জায়গা করে দিলাম ভদ্রমহিলার জন্যে। বিদেশ-বিভুঁই থেকে ফিরছেন, আর নেহাত বিপদে পড়েই না সাহায্য চেয়েছেন। মনে মনে একটু বেশ খুশীই হলাম এ কারণে, অপরিচিতা কোন মহিলার উপকার করতে পারলে একুশ বছরের রোমাণ্টিক মন যেমন খুশী হয়।

কিন্তু সেই যে উটের গল্প আছে না, নাক বাড়াতে দিলে সারা শরীরটাই ঘরে ঢোকায়, আমার অবস্থাও হলো তাই। মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতেই নারীকণ্ঠের আদেশ এল—

—দেখুন, এই জলের ফ্লাস্কটা আপনি ধরুন তো, এতগুলো জিনিস সামলানো যায়!

এ ধরনের কথাকে অনুরোধ বলা যায় না, আদেশই বলতে হয়। আর এ আদেশের মধ্যে কি যেন আছে, উপেক্ষা করা যায় না, উত্তর দেওয়া যায় না,

শুধু হুকুম মানতে হয়। সুতরাং জলের ফ্লাস্কটা আমাকেই কাঁধে ঝোলাতে হয়।

একটু পরেই আবার—এই থলিটা আপনার পায়ের কাছে রাখবেন? এখানে একরত্তি জায়গা নেই।

এইভাবে একটার পর একটা হুকুম মানতে মানতে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, ভদ্রমহিলার যাবতীয় সংসার আমার কাঁধে-কোলে ভর করেছে। অথচ বসতে পাওয়া তো দূরের কথা, তখনও পর্যন্ত ভালো করে দুটো পা রাখবার জায়গা পাই নি, এক-ঠেঙা বকের মত দাঁড়িয়ে আছি।

এমনি সময় হঠাৎ একটা স্টেশনে মিনিটখানেকের জন্যে গাড়ি দাঁড়াল। গর্ম্ সিঙাড়া থেকে চায় গর্ম অবধি নানা গানের ধুয়ো শেষ হতেই গাড়ি ছেড়ে দিল আবার।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা আঁতকে উঠলেন যেন।—ওকি, চা ডাকলেন না? আবার কখন থামবে ঠিক নেই, আপনি কি বলুন তো?

আমি যে কি বস্তু, সে বিষয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ হতে শুরু হয়েছে তখন।

তবু ঠাণ্ডা মেজাজেই বললাম, পরের স্টেশনেই বলব।

শুধু একটা কথা বলতে পারলাম না যে, আমার নিজেরও চা-পানের ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু ভদ্রমহিলা তাঁর সারা সংসারটা আমার ঘাড়ে চাপানোয় সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে রেখেছি।

যাই হোক, পরের স্টেশনে জানালায় গলা বাড়িয়ে একটা চা-ওয়ালাকে ডেকে দিলাম, ভদ্রমহিলা এক ভাঁড় চা-ও নিলেন। আর জিনিসপত্তর নামিয়ে রেখে কোনরকমে হাতটা বাড়াব আর এক ভাঁড় চায়ের জন্যে, ভদ্রমহিলা চীৎকার করে উঠলেন, নানা আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি। আপনি দেবেন না।

সুতরাং ভদ্রমহিলা যে ভুল করেন নি, এইটুকু বোঝাবার জন্যেই পকেটে হাত দিয়ে পয়সাটা দিয়ে দিতে হলো চা-ওয়ালাকে এবং নিজের চা নেবার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

আবার কিছুক্ষণ বেশ চুপচাপ কাটল।

হঠাৎ।—শুনুন, এ ভিড়ে আমি থাকতে পারব না। পরের স্টেশনেই আমাকে লেডীজ কম্পার্টমেণ্টে তুলে দেবেন।

এবারে আপত্তি করতেই হলো, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনবেন না। অগত্যা দেড় মিনিটের স্টপেজে লটবহর এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ছুটতে ছুটতে যেতে হলো। ভিড়ে ঠাসা লেডীজ কামরায় এক রকম ঠেলে তুলে

দিলাম তাঁকে। আর রেহাই পাওয়া গেছে ভেবে যেই না স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা অমনি......

—প্রত্যেক স্টেশনে এসে খোঁজ নিয়ে যাবেন কিন্তু।

ঘাড় নেড়ে সায় জানিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এসে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছি অমনি উপরের বাঙ্ক্ থেকে খোনা সুরের ডাক শুনলাম।—ও মশয়।

ফিরে তাকিয়ে দেখি, এতক্ষণ বিছানার বাণ্ডিল ভেবে যেটাকে ভুল করে-ছিলাম সেটা আসলে মানুষ। বুড়ো লোকটি এবার উঠে বসল গায়ের চাদরটা সরিয়ে। কপালে চন্দন না গঙ্গা-মৃত্তিকার তিলক, গলায় কণ্ঠী, শরীরে চামড়ার লাইনিং দেওয়া কয়েকখানা হাড়।

বৃদ্ধ উঠে বসে নাকি-সুরে বললেন, আমাদের মিস সেনকে কোথায় তুলে দিয়ে এলেন বলুন না?

মিস সেন? নিজেই বিস্মিত হলাম। বললাম, আপনার পরিচিত নাকি?

আদরে-গলে-যাওয়া শিশুর মত নাকি সুর বেরুল আবার।—হ্যাঁ, আমাদের ইস্কুলের টিচার উনি, আর আমি হেডপণ্ডিত। আমার সঙ্গেই আসছিলেন কিনা।

গলার স্বরে ক্রোধ প্রকাশ করে বললাম, আমার সঙ্গেই আসছিলেন কিনা। তা এতক্ষণ বলেন নি কেন?

বুড়ো ফোকলা মাড়ি বের করে হাসলে।—ভাবলাম আপনি বিরক্ত হবেন তাই, তা একটু বলুন না, কোন্ কামরায় গেলেন, একবার দেখা করে না এলে যদি সেক্রেটারীকে দরখাস্ত করে দেন।

সুতরাং তাঁকে পরের স্টেশনেই নিয়ে যেতে হলো লেডীজ কম্পার্টমেণ্টে। আর পণ্ডিতমশাইকে দেখেই একমুখ হেসে মিস সেন আমাকে হুকুম দিলেন, শুনুন, উনি রইলেন আপনাদের গাড়িতে, একটু দেখাশোনা করবেন। বুড়ো মানুষ, একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

তথাস্তু।

ভাবলাম, গল্পে তো পড়েছি উটটাই ঢুকেছিল ঘরের ভিতর, আবার একজন সঙ্গী ডেকে এনেছিল তা তো শুনি নি।

যাই হোক দুর্ভোগ বেশি পোয়াতে হলো না। ট্রেন এসে পেঁছিল গন্তব্যে। আর মিস্ সেনের জিনিসপত্তর কুলির মাথায় তুলে দিয়ে সুড়ুৎ করে সরে পড়ছি, তার আগেই।—পণ্ডিতমশাইকে পাঁচ নম্বর বাসে তুলে দিয়ে তারপর যাবেন যেন!

তারপর বহুদিন আর দেখা হয় নি মিস সেনের সঙ্গে।

বছর তিন-চার পরে ভাইঝিকে ইস্কুলে ভরতি করতে গেছি। দেখি হেড-মিস্ট্রেস হয়ে যিনি বসে আছেন, তাঁর মুখটা কেমন যেন চেনা-চেনা। আর আমাকেও বোধ হয় চিনতে পারলেন তিনি।

বললেন, আপনাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!

বললাম, আমারও।

কিন্তু বহু চেষ্টা করেও মনে পড়ল না। যথারীতি ভরতি করার কাজ সেরে চলে আসব, হঠাৎ হেড মিস্ট্রেস বললেন, আমার জন্যে একটা কম ভাড়ার ভালো ফ্ল্যাট খুঁজে দিন তো।

ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশের সুরটা মনে পড়ে গেল।

বললাম, আপনি তো মিস সেন? সেই যে ট্রেনের কামরায় দেখা হয়েছিল......

আরও দু-চার কথা স্মৃতিরোমন্থনে মিস সেনেরও মনে পড়ল। হেসে বললেন, আমি এখন মিসেস ভট্টাচার্য।

বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে বললেন, আসবেন একদিন, আপনাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ করাতে হবে।

ভয় পেয়ে গেলাম। কেমন স্পষ্ট কথা। তবু ভাগ্য বলতে হবে যে, তখনই কোন ফরমাস দিয়ে বসলেন না মিস সেন, মানে মিসেস ভট্টাচার্য। ফরমাস দিলেন না সে-কথাই বা বলি কি করে।

সবে আপিসঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে পা দিয়েছি, অমনি শুনতে পেলাম,—আসবেন কিন্তু, আর ঐ সঙ্গে একটা ভালো ফ্ল্যাটের খবর নিয়ে আসবেন।

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর ও-পথে নয়। এমন কি ভাইঝিকে ও ইস্কুলে রাখবো না এমন বাসনাও জেগেছিল।

কিন্তু অদৃষ্ট খণ্ডাবে কে! একটা টুথব্রাশ কিনতে গিয়ে পাড়ার স্টেশনারি দোকানটায় দেখা হয়ে গেল।

একমুখ হেসে মিসেস ভট্টাচার্য বললেন, খুব এলেন তো। চলুন, কয়েকটা জিনিস কিনে নিয়ে একটু গল্প করা যাবে।

শঙ্কিত হয়ে পকেটে হাত দিলাম। কিন্তু না, দাম নিজেই দিলেন তিনি। তারপর এক পা হাঁটেন তো তিন মিনিট দাঁড়ান। বাঃ, চমৎকার কাপগুলো তো। কত করে? আট আনা? এই বাজে কাপ? তারপরই দু-পা হেঁটে, ডিম কত করে জোড়া? আবার দু-পা এগিয়ে, ক্লিপ আছে? চুলের ক্লিপ?

এক-পা এগিয়ে, দেখি এক প্যাকেট ন্যাপথলিন। আবার খানিকটা গিয়েই, বেলফুলের মালা কত করে? দাও একটা। তারপর শো কেসের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা।

পাক্কা দেড় ঘণ্টা। কোমরে ব্যথা, পা টনটন।

শেষকালে মিসেস ভট্টাচার্য বললেন, চলুন আমাদের বাসায়।

গেলাম। অর্থাৎ যেতে হলো।

ছোট দু-কুঠরির ফ্ল্যাট। এক ফালি বারান্দাই রান্নাঘর।

একটা ইজিচেয়ারে একজন বৃদ্ধ বসে ছিলেন। চিনতে পারি নি তাঁকেও।

মিসেস ভট্টাচার্য আলাপ করিয়ে দিলেন সহাস মুখে।—ইনিই মিস সেনকে মিসেস ভট্টাচার্য করেছেন। আর এঁকে তো তুমি দেখেছ, সেই যে একবার পুজোর ছুটিতে ট্রেনে......

—বসুন। নাকি সুর শুনেই মনে পড়ে গেল। বাঙ্কে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকা পণ্ডিতমশাই, যিনি সেক্রেটারীর কাছে দরখাস্ত করে দেবে এই ভয়ে মিস সেনের খবর নিতে নেমেছিলেন!

কেনা-কাটা জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে মিসেস ভট্টাচার্য স্বামীর তদারকিতে মন দিলেন। পায়ের ব্যথাটা কমেছে একটু? তেলটা মালিশ করে দেব?

পণ্ডিতমশাই 'না না' করে উঠলেন।

মিসেস ভট্টাচার্য তবু শান্ত হলেন না।—দাঁড়াও মিকশ্চারটা এনে দিই – বলে ওষুধের শিশি-গেলাস নিয়ে এলেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম এবং ভালো করে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলাম পণ্ডিতমশাইকে। রোগা হাড়-জিরজিরে শরীরে ধোপদুরস্ত আদ্দির পাঞ্জাবি, জরিপাড় শান্তিপুরী ধুতি, হাতের দশটা আঙুলে আটটা আংটি, সোনার রিস্টওয়াচ, পায়ে লাল মখমলের চটি। সে এক কিম্ভূত চেহারা।

ইতিমধ্যে ওষুধ খাইয়ে পদসেবা শুরু করে দিয়েছেন মিসেস ভট্টাচার্য। মালিশ শেষ করে খাবারের থালা নিয়ে এসে আসন পেতে দিলেন, তারপর পণ্ডিতমশাইকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন।

তারপর ছোট ছেলেদের মা যেভাবে খাইয়ে দেয় ঠিক সেইভাবেই পণ্ডিতমশাইয়ের মুখে খাবারের গ্রাস তুলে দিতে শুরু করলেন মিসেস ভট্টাচার্য।

শেষে কাজ সেরে হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলেন।

পণ্ডিতমশাইকে উদ্দেশ করে বললেন, এ বাসাটা তোমার ভাল লাগছে না বলছিলে, তা এঁকে বলেছি একটা ফ্ল্যাট খুঁজে দিতে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একটু তাড়াতাড়ি খুঁজে দেবেন, বুঝলেন।

আরও দু-এক কথার পর উঠে গেলেন। আশা করেছিলাম এক কাপ চা অন্তত আসবে। কিন্তু তাও এল না।

কিছুক্ষণ পরে উঠে চলে আসছি, হঠাৎ মিসেস ভট্টাচার্য সামনে এসে দাঁড়ালেন, ও কি চলে যাচ্ছেন? ও একা থাকবে বলে বসিয়ে এলাম। যান একটু গল্পগুজব করে ভুলিয়ে রাখুন ওঁকে, আমি পরীক্ষার খাতাগুলো দেখে নিই।

সুতরাং ফিরে এসে বসতে হলো। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা দিলেন মিসেস ভট্টাচার্য, নতুন ফ্ল্যাট খুঁজে দেওয়ার হুকুম জানিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

বললাম, দেখব। কিন্তু ওঁর জন্যে তো আপনাকে খুব খাটতে হয় দেখছি।

মিসেস ভট্টাচার্য হাসলেন।—কী যে বললেন, ওঁর জন্যেই তো আজ ইস্কুলের টিচাররা আমাকে এত মান্য করে, ঈর্ষা করে, তা জানেন?

ঈর্ষা করে। কথাটা শুনে আপনা থেকেই চোখ গেল মিসেস ভট্টাচার্যের সিঁথির সিঁদুরের দিকে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগল মনে। মানুষ সুখী হতে চায়? না সুখে আছি, এ কথা জানিয়ে সুখী হয়?

[১৩৬০]

রুমা বাঈ

যখনকার কথা বলছি আনারবাগ তখন নেটিভ স্টেট ইনামপুরের রাজধানী। নতুন বা পুরোনো কোন মানচিত্রেই অবশ্য এ নাম দুটো খুঁজে পাবেন না। কারণ, নিখাদ সত্যি ঘটনাটা বলবার মত দুঃসাহস আমার নেই এবং বলা হয়তো উচিতও নয়। ডাল্টনবাজারের ইতিহাস আমি যেভাবে মহুয়া-মিলনের নামে চালিয়েছি, রুমাবাঈকে নিয়ে গল্প লিখতে হলেও সেই পন্থাই অনুসরণ করতে পারতাম। কিন্তু যে স্টেটেরই নাম দিই না কেন, কে বলতে পারে সেখানেই রুমাবাঈ ধরনের অন্য কোন চরিত্র আছ কিনা। গল্পকে নিছক গল্প হিসেবে স্বীকার করেন না, এমন পাঠকের অভাব নেই এবং সে কারণেই সম্প্রতি আমি একটু বিপদেও পড়েছিলাম।

রুমাবাঈ অবশ্য আজ আর বেঁচে নেই, থাকলেও এ গল্প পড়ে হয়তো খুশীই হতেন। কিন্তু উষ্মা প্রকাশ পেতো রাজা প্রতাপকিংকর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের ব্যবহারে।

আশ্চর্য এই যে, আনারবাগের পঞ্চান্ন বছরের আধ-পাগলা রাজা বাহাদুরের কাছে রুমাবাঈয়ের চরিত্রের কোন দিকটাই অজ্ঞাত ছিল না।

রাজা বাহাদুরের খাস আস্তাবলের হেড্ সহিসের সুন্দরী স্ত্রী জাহানারার সঙ্গে প্রতাপকিংকর চন্দ্রনারায়ণ সিংহের নাম জড়িয়ে গোপনে হাসাহাসি করতো অনেকে এবং পরপর নানা ঘটনার সূত্র জুড়ে কিউ ই ডি লিখে প্রণাম করে দিতো যে রুমাবাঈ আসলে রাজা বাহাদুরের মেয়ে।

হলেও আপত্তি করবার কিছু ছিল না। রূপে এবং বলা বাহুল্য যৌবনে, রুমাবাঈ ছিল একেবারে ষোল আনা রাজকন্যে।

তখন পর্যন্ত আমি রুমাবাঈ নামটাই শুনেছি, স্বচক্ষে তাঁর দর্শন পাবার সৌভাগ্য হয় নি। কারণ, আমি ইনামপুর স্টেটের প্রজা ছিলাম না। আনারবাগের নতুন সুগার ফ্যাক্টরীতে চাকরী নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে।

এখন অবশ্য আমি ইনামপুর স্টেটের পাইক-বরকন্দাজদের নাগালের বাইরে এবং রাজা বাহাদুরের প্রতাপও এখন শুধু তাঁর নামেই, তাঁর স্বেচ্ছাচারের আইন এখন ঠুঁটো হয়ে গেছে। তবু তাঁকে ভয় করার একটি

কারণ আছে। যে হেভি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীটায় আমি এখন চাকরী করছি, তার রেসিডেন্ট ডিরেক্টর কালে সাহেব প্রতাপকিঙ্করের পিয়ারের দোস্ত।

সুপারিশ পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি লোকটা যে কে তা রাজা বাহাদুর স্বচক্ষে কোনদিন দেখেন নি। স্বচক্ষে তিনি কিছুই দেখতেন না। ফর্সা গোলগাল চেহারা, বাকীটা ভোজপুরী দারোয়ানের মত। আর এই শরীরের ওপর একরাশ মখমলের রাজবেশ, মখমলের ওপর সোনালী জরি, লাল-নীল নানা দুর্মূল্য পাথর চুমকির মত বসানো। সিংহাসনে বসে মাথার মুকুট পরে একটা ছবি তুলিয়েছিলেন প্রতাপকিঙ্কর, আর সেই ছবিটাই তিন রঙে ছাপা ক্যালেন্ডার হয়ে আমাদের সকলের মেসে কোয়ার্টারে শোভা পেতো।

তাই রাজা বাহাদুরকে আমরা সকলেই চিনতাম। চিনতাম না রুমাবাঈকে।

সেদিন শুক্ল তিথির জোছনার রাতে শরীরে মলমল জড়িয়ে কোথায় রোমান্সের পক্ষীরাজে উড়ে বেড়াবার কথা, তা নয় হঠাৎ কেমন যেন বেতো বুড়োর মত খিটখিটে হয়ে উঠেছিলাম। হয়তো চাকরীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েই।

একশো পঁচিশ টাকা মাইনেতে বহাল হয়ে গিয়েছিলাম আনারবাগের সুগার ফ্যাক্টরীতে, যে কারখানার স্বত্বাধিকারী ছিলেন স্বয়ং রাজা প্রতাপ-কিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর। আর যেহেতু স্টেটের দেওয়ানজী মিস্টার রায় এবং চিনির কারখানার মাদ্রাজী ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামী, এ দুজনের একজনেরও আশ্রিত লোক ছিলাম না, সেইজন্যেই হয়তো স্থায়ীভাবেই আমাকে রাতের শীফ্‌টে ফেলে দিয়েছিলেন য়্যাসিস্টেণ্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার করিম সাহেব।

ডাকে পাওয়া নিয়োগপত্রটি নিয়ে যেদিন প্রথম হাজির হলাম করিম সাহেবের কামরায়, সেদিনই টের পেয়েছিলাম, কপালে কি দুর্ভোগ আছে।

ফাইল ঘেঁটে আমার দরখাস্তটার ওপর চোখ বুলিয়ে কি যেন খুঁজে পেলেন না করিম সাহেব। অন্তত তাঁর মুখচোখ দেখে তাই মনে হয়েছিল।

আর সেই জন্যেই বোধ হয় ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কার লোক তুমি?

প্রশ্নটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু বুঝতে না পারলে যে শুনতে পাই নি এমন একটা মুখভাব করে বেগ ইওর পার্ডেন বলতে হয় সে বিদ্যে রপ্ত ছিল।

করিম সাহেব উল্টে চটেই গেলেন।

—কানে কম শোনো নাকি? কার লোক তাই জিজ্ঞেস করছি?

বললাম, আজ্ঞে তা তো জানি না, কাগজে কেমিস্ট চাই বিজ্ঞাপন দেখে এপ্লাই করেছিলাম।

—আই সী! অস্ফুটে বললেন করিম সাহেব, তারপর আমার নিয়োগপত্রের এক কোণে লাল কালিতে লিখলেন, রেকমেনডেড ফর নাইট শীফ্‌ট। লিখে নীচে নাম সই করে বললেন, ঐ যে গলাবন্ধ কালো কোট পরে কেরানীবাবু বসে আছেন, ওর কাছে যাও। গিয়েছিলাম, এবং যাওয়ার পর সেই যে নাইট শীফ্‌টের ইনচার্জের সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তারপর থেকে একদিনের জন্যেও দিনের শীফ্‌টে বদলি হতে পাই নি।

ফলে সাবারাত ডিউটি দিয়ে এসে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোতাম, আনারবাগের লোকজনের সঙ্গে ভালো করে আলাপ করার সুযোগও পাই নি। তাই বোধ হয় সেদিন ঘুরন্ত পিনিয়নটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটা অসহ্য বিতৃষ্ণা জমা হচ্ছিল মনের মধ্যে।

কারখানাটা ছিল বেশ খানিকটা উঁচু টিলার গায়ে। কিছুটা সমতল জমি কারখানার এলাকা পার হয়ে, তারপর ঢালু নেমে গেছে নীচের কুলিকামিনদের বস্তী অবধি।

একটা মোটা জলের পাইপ অতিকায় একটা অজগরের মত নেমে এসেছে ওপবের রিজারভয়ের থেকে, এসে ঢুকেছে কাবখানার ভেতর। কুলিমজুরর হট্টগোল এড়িয়ে বাইরে বসেছিলাম পাইপটার ওপর। বসে বসে দেখছিলাম আনারবাগের রূপ।

পূবের সীমান্তে যতদূর চোখ যায় শুধুই হিমাচলের আঁকাবাঁকা তরঙ্গ। যেন সুদীর্ঘ একখানি শ্যামল শাড়ী বিছানো আছে আকাশের গায়ে। জ্যোৎস্নার রোশনাই লেগে তুষারশুভ্র হিমচূড়ার রেখাটি যেন ফিকে রূপালী রঙের পাড়। কোন দৈত্যের কঙ্কালের মত চারপায়া উঁচু রিজারভয়ারের পিছনে ধোঁয়াটে আকাশের গায়ে বড়ো এক টিপ চাঁদ।

আনমনা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম সেদিকে।

মেশিন চলছে। কেরিয়ার থেকে আখের রাশি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ক্ষিদে মেটাচ্ছে রসলোভী যন্ত্রের।

অবিরত শোঁ-শোঁ শব্দ, আর পিনিয়নের মূর্ছনা। পিনিয়নের দাঁতে দুটি বিশাল হিংস্র চাকার মধ্যে রাশি রাশি আখ মাড়াই হচ্ছে, একদিকে

জমা হচ্ছে ছোবড়ার রাশ, আর অন্যদিকে একটি উন্মুক্ত চোঙা বেয়ে ঢলে পড়ছে আখের রস।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একটি ছায়াশরীর এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

এতখানি দূর থেকে স্পষ্ট দেখা গেল না, কিন্তু লোকটি যেন এক আঁজলা রস তুলে পান করবার জন্যে ঝুঁকে পড়লো।

কুলিমজুরদের সংগে কাজ করে করে মেজাজটাও হয়ে উঠেছিল রুক্ষ।

চিৎকার করে উঠলাম।—এই বেকুফ!

ছায়াশরীর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, শব্দ লক্ষ্য করে তাকালো আমার দিকে।

এগিয়ে যেতে যেতে রুক্ষস্বরেই বললাম, কি করছিলে?

কিন্তু ততক্ষণে আমি আরো কাছে পৌঁছে গেছি। চাঁদের আলোয় তার শরীরের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরুষ নয়।

বব্ করা নরম চুল, উলের আঁট ব্লাউজ, ট্রাউজারের কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভংগীতে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

—বলছিলে কিছু? পরিষ্কার উর্দুতে নারীকণ্ঠের শান্ত প্রশ্ন শুনলাম।

গলার স্বর আপনা থেকেই নরম হলো, বললাম, কি করছিলেন আপনি? এ রসে হাত দেওয়া বে-আইনী।

মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো।—বে-আইনী? বলে চুপ করলে মেয়েটি।—আমি কে জানো হে ছোকরা? আমি রুমাবাঈ।

রুমাবাঈ! সমস্ত শরীরে যেন শিহরণ খেলে গেল। আর পরমুহূর্তেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। অস্বস্তি, না ভয়?

আপনা থেকেই গলার স্বর শান্ত হলো। যন্ত্রচালিতের মত তিনবার কুর্ণিশ করে তিন পা পিছিয়ে এলাম, সন্ধ্যের সময় একদিন দেওয়ানজী মিস্টার রায় কারখানা দেখতে আসায় ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামী যেভাবে কুর্ণিশ করেছিলেন ঠিক সেইভাবে।

তারপর মাথা তুলে দেখলাম রুমাবাঈ যেন কৌতুকের হাসি হাসছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, নতুন এসেছো, না? কোথাকার লোক তুমি?

—বেংগল। ছোট্ট একটি কথা, তাও যেন জিভে জড়িয়ে গেল।

—তাই বলো। কিন্তু একটু ভদ্র হতে চেষ্টা করো। কারণ এটা বাংলা দেশ নয়, আর রুমাবাঈয়ের ইচ্ছাটাই এখানে আইন।

এত চেষ্টা করেও হাত দুটোকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখতে পারলাম

না, হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, এ রস তো খেতে পারবেন না, এতে ধুলো-বালি-ময়লা মিশে আছে, একটু অপেক্ষা করেন তো ভালো টাটকা রস এনে দিচ্ছি। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছুটে গেলাম।

মিনিট দুই পরে কাঁচের গ্লাসে টাট্‌কা এবং ছাঁকা পরিষ্কার রস নিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন রুমাবাঈ উধাও। এদিক্‌ ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম প্যালেসের দিকে এঁকেবেঁকে যে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে সেই রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছ একখানা মোটরবাইক। আর মোটরবাইকের আরোহীর দেহরেখাটা যেন রুমাবাঈয়ের বলেই মনে হলো।

সে রাত্রিতে আর কাজে মন বসলো না। একটি নাম কেবলই ঘুরে বেড়ালো কানের চারপাশে, বিভীষিকার মত। রুমাবাঈ! রুমাবাঈ!

কারখানার প্রতিটি কর্মীর কাছে কতবার শুনেছি এ নাম। কত গোপন রসিকতা, কত অবোধ্য রহস্য। ভয় আর ভালোবাসা। বিদ্যুতের মত যার আকর্ষণ। বিদ্যুতের মতই যার চোখে মৃত্যুর পরোয়ানা।

সমস্ত শরীরে জরাতুর উত্তাপ আর মনে দুশ্চিন্তার পাথর নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম সে রাত্রে।

তারপর দুপুরে এক সময় ডাক পড়েছিল করিম সাহেবের কাছে।

ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

করিম সাহেব একরাশ কাগজপত্রের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে বসেছিলেন, মাথা না তুলেই বললেন, নাইট শীফ্‌টে তুমি ছাড়া আর কোন বাঙালী আছে?

বললাম, না স্যার।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন করিম সাহেব, মাথা তুললেন না। তারপর এক সময় হঠাৎ বললেন, তোমার সাহস তো কম নয়, ম্যানেজারের কাছে কম্‌প্লেন করেছো আমার নামে?

—কমপ্লেন করেছি? বিস্মিত হলাম।

—কর নি? নাইট শীফ্‌টে রেখেছি বলে দরখাস্ত কর নি তুমি?

—না স্যার।

—হুঁ। আচ্ছা যাও, কাল থেকে ডে শীফ্‌টে কাজ করবে। করিম সাহেব এবারেও মাথা না তুলেই বললেন।

চলে আসছিলাম, হঠাৎ বললেন, মিস্টার কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে দেখা করো।

দুর্বোধ্য বিস্ময় আর আশঙ্কার অনুরণন বাজলো মনের কোণে। তবু ভয়ে ভয়ে গিয়ে দেখা করতে হলো ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে।

নমস্কার করে বললাম, ডেকেছেন আমাকে?

অনেকক্ষণ ধরে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মিস্টার কৃষ্ণস্বামী বললেন, দেওয়ানজী মিস্টার রায় তোমার রিলেটিভ? আগে বল নি কেন?

বললাম, আজ্ঞে না, দেওয়ানজী আমাকে চেননও না।

কৃষ্ণস্বামী হাসলেন। চেনেন না? অথচ তোমাকে ডে সীফ্‌টে বদলি করবার জন্য ফোন করেছিলেন আমাকে?

বললাম, বিশ্বাস করুন—

—রাতের শীফ্‌টে তো তুমিই একমাত্র বাঙালী?

বললাম, হ্যাঁ স্যার।

কৃষ্ণস্বামী কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা যাও। কাল থেকে ডে শীফ্‌টে।

চলে এলাম। কিন্তু যে খবব শুনে খুশী হয়ে ফিরে আসার কথা, সে খবর শুনেই কেমন যেন আতঙ্ক বোধ করলাম।

দেওয়ানজী মিস্টার রায়। তিনি বলেছেন আমাকে দিনের শীফ্‌টে বদলি করতে? কেন? আমাকে চিনলেনই বা কি করে? ভাবলাম, কে জানে আমি যে বাঙালী সে খবর হয়তো তাঁর কানে গেছে। তাই তিনি রাত্রির নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন আমাকে। কিংবা, কে জানে, দেওয়ানজীর সুপারিশে চাকরি পাওয়া বীরেন বক্সীই হয়তো সহকর্মীর জন্যে এ কাজটুকু করে দিয়েছে।

দিনের পাল্লায় আমি এবং বীরেন বক্সী ছাড়াও আরো পাঁচজন বাঙালী ছিল। তাই কাজের সঙ্গে আড্ডা আর গল্পগুজব যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গিয়েছিল। কৃষ্ণস্বামী এবং কবিম সাহেব সাধারণত দপ্তরেই বসে থাকতেন, দু-এক মিনিটের জন্যে যদি-বা আসতেন তো বাতাসের আগে সাবধানবাণী পেঁছে যেত।

সেদিনও অমনি কানে কানে খবর এলো, রুমাবাঈ আসছে, রুমাবাঈ আসছে। সঙ্গে দেওয়ানজী।

মিনিট কয়েক পরে কৃষ্ণস্বামী এবং করিম সাহেবের সশ্রদ্ধ পথপ্রদর্শনকে তাচ্ছিল্যভাবে উপেক্ষা করতে করতে রুমাবাঈ এগিযে এলেন। মেশিন নয়, মানুষগুলোর দিকেই যেন তাঁর চোখ। কিন্তু ছিমছাম চেহারার দেওয়ানজীব দৃষ্টি কাজের দিকে। আমরা দেখলাম শুধু রুমাবাঈকে।

সেদিন রাত্রিতে রুমাবাঈকে দেখেছিলাম, আর এ রূপ যেন ভিন্নজনের। দামী রেশমের শাল্‌ওয়ার আর পাঞ্জাবীতে তাজা রক্তের বর্ণাভা, সলমা চুমকির ঝলমলানি আর গোলাপী ওড়নার প্রান্ত লুটিয়ে আছে যৌবনোদ্দীপ্ত বুকেব

ওপর। চোখের নীচে সূক্ষ্ম সুর্মার লোভানি। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দৃষ্টি, সুডৌল হাত যেন গোলাপের পাপড়ি দিয়ে মাজা, যৌবনপুষ্ট জঙ্ঘায় অস্থির চঞ্চলতা।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়লো, কাছে এগিয়ে এলেন রুমাবাঈ। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বিজন আচার্যের দিকে দৃষ্টি ফিরলো তাঁর।

—এই ছোক্‌রা, শোনো এদিকে।

বিজন এগিয়ে এলো, কুর্ণিশ করে সামনে দাঁড়ালো।

রুমাবাঈ জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার?

নাম বললে বিজন।

আমাদের ফ্যাক্টরীর তৈরী এক মুঠো চিনি দেখালেন মিস্টার কৃষ্ণস্বামী।

সন্তুষ্ট হলেন না রুমাবাঈ।—এ তো স্রেফ ধুলো, এর চেয়ে বড়ো দানা হয় না?

জাভা চিনির নমুনাটা কারখানায় তৈরী বলে দেখিয়ে দিলেন কৃষ্ণস্বামী। বললেন, দুরকমই হয়।

দেখে সন্তুষ্ট হলেন রুমাবাঈ। ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন।

আর ওরা সদলবলে চলে যাওয়ার পর ঠাট্টা শুরু করলাম আমরা বিজনকে নিয়ে।

আমার চেয়ে বয়েসে ছোটই ছিল বিজন। কিন্তু শুধু সেই জন্যেই নয়, বিজনের ওপর আমাদের সকলেরই কেমন একটা দুর্বলতা ছিল অন্য কারণে। রুমাবাঈকে দোষ দেওয়া যায় না, কোন নারীমন বিজন আচার্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, আর সে চেহারার চুল এবং চোখে কি অনুপম মাধুর্য। অথচ পোশাক-পরিচ্ছদ নোংরা, সব সময়েই মেশিনের তেল আর কালি লেগে আছে। তার কারণ, বিজনের চাকরিটা ছিল অতি নগণ্য। মেশিন পরিষ্কার করা, দাঁতে দাঁতে মোবিল ঢালা; মাইনে ছিল পঞ্চান্ন টাকা, সে বাজারেও তা লোভনীয় ছিল বলেই বাংলাদেশ ছেড়ে এত দূরে আসতে হয়েছিল তাকে।

কিন্তু আমাদের প্রাদেশিক আভিজাত্যে ঘা লাগতো তার জন্যে। বিজনের চেয়েও তো কম কোয়ালিফায়েড লোক ছিল ইনামপুর স্টেটের সুগার ফ্যাক্টরীতে। অথচ বিজনের বেলাতেই কিনা এমন চাকরি?

সেই বিজনকে ডেকে কথা বলেছেন রুমাবাঈ, সুতরাং রসিকতা করতে ছাড়বো কেন আমরা।

বললাম, দেখিস ভাই, সেদিন রাত্তিরে খুব ফাঁড়া কেটে গেছে, বিপদে পড়লে বাঁচাস বিজন।

শুধু বক্সী হেসে বললে, সাবধান বিজন, রুমাবাঈ কিন্তু একটি আসল 'কেন ক্রাশার'। আখ হয়ে ঢুকলে—

নিষ্কাশিত-রস ছিবড়ের স্তূপটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হাসলো বক্সী।

রহমান, আয়ার, মিশ্র কেউই ঠাট্টা করতে কসুর করলে না।

কিন্তু ঠাট্টা যে সত্যি হতে পারে তা আমরা কেউ কল্পনাও করি নি।

আনারবাগের একটা দিকের নাম ছিল বাঙালীটোলা। স্টেটের বাঙালী চাকরেরা সকলেই থাকতেন সেই পাড়ায়, একমাত্র দেওয়ানজী মিস্টার রায় ছাড়া। বাঙালীটোলার কালী মন্দিরের পাশেই ছিল একটা মেস, আর সেই মেসে আমরা জন পাঁচিশেক লোক থাকতাম। সুগার ফ্যাক্টরীর সাতজন, হেভি কেমিক্যালস্-এর কয়েকজন, আর্ট স্কুলের একজন শিক্ষক, মেয়েদের কলেজের একজন কেরানী এবং আরো যেন কে কে। বৃহস্পতিবারটা ছিল আমাদের ছুটির দিন।

সকালের চা আর ডাকযোগে আসা বাসি খবরের কাগজ নিয়ে বারান্দায় বসে আছি আমরা,-হঠাৎ লাল রঙের টু-সীটারখানা দেখা দিল।

শোঁ করে বাঁক নিয়ে একেবারে আমাদের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা।

দেখলাম, স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন রুমাবাঈ।

মেসের দরোয়ানটা ছুটে গেল, ফিরে এলো তটস্থ হয়ে। আচারিয়া সাহেবকে ডাকছেন রুমাবাঈ।

হাঁটুতে হাঁটু ঠেকলো বিজনের, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দাঁড়াল বিজনকে আর আমাদের চোখের সামনেই বিজনকে পাশে বসিয়ে গাড়ি
বিজনকে, আর আমাদের চোখের সামনেই বিজনকে পাশে বসিয়ে গাড়ি
ছেড়ে দিলেন।

হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম সকলে। এমন ঘটনা যেন গল্পেই ঘটে। গল্পেও নয়। শুধু দুর্নামী রটনায়।

বক্সী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, লাজ-লজ্জার বালাই নেই। একেবারে—

জানি না, বক্সী হয়তো এখনো আনারবাগেই আছে, সুতরাং তার

শেষ কথাটা না বলাই ভালো, কিন্তু মানুষ কথায় আর কতটুকু প্রকাশ করতে পারে, মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণাকে ভাষা দেবার মত বাহন হয়তো এখনো আবিষ্কৃত হয় নি।

রুমাবাঈ! যে নামটা এতদিন ছিল বিস্ময়ের, আশঙ্কার, আতঙ্কের কণ্ঠে উচ্চারণ করবার মত, সেই নাম যেন ঘৃণার মন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। আর দুঃখ হলো বিজনের জন্যে। ওর কি দোষ, কি করতে পারে ও বেচারী, এই অনাচারের রাজত্বে।

কিন্তু আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি নি, কখন থেকে বিজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম।

প্রথম দিন বিজন ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোথায় গিয়েছিলি, কেন ডেকে নিয়ে গেল?

শুনে হেসেছিল বিজন।—তোমরা যা ভাবছো তেমন কিছু নয়।

আমরা কিন্তু বিশ্বাস করি নি। না করারই কথা। দিনে দিনে পরিবর্তন লক্ষ্য করতাম বিজনের। পোশাক-পরিচ্ছদে সব সময়েই ফিটফাট হয়ে থাকতো বিজন। কোনদিন নিজেই আসতেন রুমাবাঈ, কোনদিন বা গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন।

প্যালেসের দর্জি শেখ সাহেব আসতো কোন কোনদিন. আর আমরা যেভাবে কুর্ণিশ করেছিলাম রুমাবাঈকে, সেইভাবেই বিজন আচার্যকে কুর্ণিশ করতো দর্জিটা।

দেখে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম আমরা। কিন্তু বিজনের সামনে হাসিঠাট্টা করতে সাহস হত না। বুঝতে পারি না, আপনা থেকেই বিজনকে ভয় পেতে শুরু করেছি আমরা।

ইতিমধ্যে ধাপে ধাপে চাকরিতে উন্নতি হচ্ছিল বিজনের। মেশিন-ইন-চার্জ থেকে সুপারভাইজার, সুপারভাইজার থেকে প্রোডাকশন ম্যানেজার। যিনি প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিলেন তাঁকে বদলি করে দেওয়া হলো হেভি কেমিক্যালসের ফ্যাক্টরীতে। আর আমি হলাম ব্লিচিং ডিপার্টমেন্টের কেমিস্ট-ইন-চার্জ। মাইনে এক পয়সা বাড়লো না, বাড়লো কাজ।

সেইজন্যেই যত রাগ গিয়ে পড়লো বিজনের ওপর। যার জন্যে সহানুভূতি দেখাতাম, তাকেই ঈর্ষা করতে শুরু করলাম।

সহানুভূতি থেকে ঘৃণা, ঘৃণা থেকে ভয়, ভয় থেকে ঈর্ষা। আশ্চর্য মানুষের মন! কথাবার্তা একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। প্রয়োজনের সময়ে যে দু-চার কথা বলতাম তাও মেপেজুখে। যে অন্তরঙ্গতার সূত্রে

বাঁধা ছিলাম আমরা তা থেকে যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল বিজন!

মেস ছেড়ে অন্য একটা বাড়িতে উঠে গেল ও, আর আমরা একজোট হলাম ওর বিরুদ্ধে। আলোচনা করতাম, ষড়যন্ত্র করতাম কিভাবে জব্দ করা যায় বিজনকে।

নাইট শীফ্‌টের সকলেই ছিল আমার পরিচিত। তারা জানতো, প্রোডাকশন ম্যানেজার হওয়ার যোগ্যতা নেই বিজনের। তার না ছিল শিক্ষা, না অভিজ্ঞতা। তবু কেন সে সকলের মাথার উপর চড়ে বসে থাকবে!

এ, পি, এম. ছিলেন ধুরন্ধর লোক। বিজনের ওপর তিনিও ছিলেন অসন্তুষ্ট। তাই আমাদের কথা শুনে অসহযোগ শুরু করলেন তিনি। বিজনের আদেশটুকুই মানতেন, নিজের বিদ্যেবুদ্ধির সাজেশন দিয়ে এতটুকু উপকার করতেন না। ফলে, প্রোডাকশন কমতে লাগলো। এ ছাড়া, আজ এ মেসিন বন্ধ, কাল ওটা খারাপ। আর কেমিস্টের কারসাজিতে যা তৈরী হতে শুরু হলো, কাশীর চিনিও তার তুলনায় উঁচু দরের।

দ্রুত উন্নতির তালে তালে চলতে পারলো না বিজন, মেজাজ হয়ে উঠলো রুক্ষ।

বিজনের ব্যবহারে কুলিমজুরদের মধ্যেও অসন্তোষের বীজ ছড়িয়ে পড়লো।

তবু টনক নড়লো না ম্যানেজারের। খোদ রুমাবাঈ যার সহায়, তাকে আমরা অপদস্ত করবো কি করে।

ওদের সন্ধ্যাভিসার জ্বালা ধরিয়ে দিতো আমাদের মনে। কোনদিন দেখতাম গুলাব মহলের ঝাউবাগানে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে বিজন আর রুমাবাঈ। কোনদিন বা পাহাড়ী ঝর্ণাটার ধারে জলে ভাসা পাথরে বসে গল্পগুজবে মত্ত।

আশ্চর্য চোখ ঝলসানো রূপ ছিল রুমাবাঈয়ের। আসমানী স্বচ্ছ শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে জ্বলতো তার যৌবনের উদ্দামতা, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য।

একদিন দেখেছিলাম, সঙ্কীর্ণ গিরিপথ বেয়ে চলেছে একজোড়া আরবী ঘোড়া। ফুটফুটে সাদা ঘোড়াটার পিঠে দৃপ্ত ভঙ্গীতে বসে আছেন রুমাবাঈ।

আরেকদিন দূর থেকে দেখেছিলাম, সুইমিং কস্টিউম পরে স্নান করছেন রুমাবাঈ, ঝর্ণার জলে নেমে। সে কি হাসাহাসি, পরস্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে সাঁতার কেটে দূরে পালানো।

স্নান সেরে একটি শ্বেতাভ পাথরের ওপর এসে দাঁড়ালো রুমাবাঈ।

নারীর শরীর নয়, যেন জ্বলন্ত কামনা।

ধরা পড়ার ভয়ে দূর থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন।

কিন্তু বিজন পালিয়ে আসতে পারে নি।

ও হয়তো সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল রুমাবাঈকে। তা না হলে কি মোহিতকুমারীকে বিয়ে করতে রাজী হত ও?

খবরটা এনেছিল বক্সী।—শুনেছো ব্যাপার? বিজনের সঙ্গে মোতিকুমারীর বিয়ে দিতে চায় রুমাবাঈ।

—মোতিকুমারী কে? প্রশ্ন করেছিলাম।

বক্সী বিস্মিত হয়েছিল। —সে কি? চেনো না তাকে? স্টেটের মেডিক্যাল অফিসারের মেয়ে। রোগা আর কুৎসিত চেহারার মেয়েটা, যে মেয়েদের ইস্কুলে টিচারী করে। দু-বেলা তো যায় এখান দিয়েই।

চিনতে পেরেছিলাম। যৌবন বয়সেও যে নারীদেহ কত কুৎসিত হতে পারে মোতিকুমারীকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

তাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, বিয়ে দিয়ে রুমাবাঈয়ের লাভ?

বক্সী হেসেছিল, উত্তর দেয় নি।

তারপর বলেছিল, রাজকন্যার খেয়াল। তোমাকে যে রাতের শীফ্‌ট থেকে দিনে বদলি করিয়েছিল, কেন? লাভ ছিল ওর?

—সে কি? রুমাবাঈ বদলি করিয়েছিল? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

বক্সী শুনে হাসলো। —জানতেন না?

বললাম, কোন্ খবরটাই বা আমরা জানি। কিন্তু মোতিকুমারীর সঙ্গে যদি বিজনের বিয়ে হয় তা হলে খুশী হবো। কিংবা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে যদি খোঁড়া হয়।

বক্সীও হেসেছিল। —হবে, হবে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

যে কোন ভাবে বিজনের ক্ষতি করতে পারলে, বিজনকে অসুখী দেখতে পেলে তখন সত্যিই খুশী হয়ে উঠতাম। আমাদের সকলের কাছেই ও তখন চক্ষুশূল।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিজনও যে রুমাবাঈয়ের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, জানতাম না।

সন্দেহ হলো যেদিন শুনলাম চিনির কারখানা থেকে হেভি কেমিক্যালসে বদলি হয়েছে বিজন।

বক্সী বললে, শুনেছো খবর? পাঁচশো থেকে তিনশো টাকায় নামিয়ে

দেওয়া হয়েছে বিজনকে।

—সত্যি?

আজ স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু সেদিন সত্যিই খুশী হয়েছিলাম। আমাদের সমস্ত পরাজয়, সব গ্লানি যেন মুছে গেল এই একটি খবরে।

ঠিক যেমনভাবে ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে উঠেছিল, তেমনি ধাপে ধাপে নামতে শুরু করলেনও। আর আমরা সকলেই তার দুর্দশা দেখে আনন্দে আত্মহারা হলাম। কারণটা অজানা রইলো না। রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর তখন তিনখানা ডাকোটা বিমান কিনেছেন, আনারবাগ থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে। আর এই ডাকোটা বিমানের পাইলট হয়ে যে তিনজন নবাগতের আগমন হলো তাদের একজন হলো নিহাল। পাঞ্জাবী হিন্দু অর্থাৎ দাড়িগোঁফ চাঁছা সুশ্রী চেহারা, যেমন সুশ্রী তেমনি স্মার্ট।

এই নিহালের সঙ্গে প্রায়ই আকাশ-বিহার যেতে শুরু করলেন রুমাবাঈ। শুনতে পেতাম রুমাবাঈ নিজেও নাকি প্লেন চালানো শিখছেন।

অসম্ভব মনে হত না, কারণ রুমাবাঈয়ের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব ছিল না। ধুলিয়াবাবার আশ্রমের পাশ দিয়ে যে শীর্ণ খাড়াই পথটা পাহাড়ের গা বেয়ে একেবেঁকে টুমুরিয়ার দিকে উঠে গেছে সেই দুর্গম পথ বেয়ে যেদিন ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছিলাম রুমাবাঈকে, তারপর থেকে ধারণা হয়েছিল, রুমাবাঈয়ের পক্ষে সবই সম্ভব।

বৈমানিক নিহালের সঙ্গে মাঝে মাঝে রুমাবাঈকে দেখতে পেতাম আংরেজবাজারে। কখনো-বা ইম্পিরিয়েল ক্লাবের টেনিস লনে।

দেখে খুশী হতাম আমরা, খুশী হতাম এই ভেবে যে, নিহাল বিজন নয়।

বিজন যেদিন হেভি কেমিক্যালস্ থেকে সুগার ফ্যাক্টরীতে ফিরে এলো, কৌতুকের হাসি হেসে বললাম, দেখছিস্ বক্সী, বাছাধনের মুখটা একেবারে চুন!

বক্সী হেসেছিল।—দুদিনের জন্যে খুব নবাবী করে নিলো যা হোক্। ভাগ্যিস্ দেওয়ানজীর কানে তুলেছিলাম।

—তার মানে?

বক্সী হেসে বলেছিল, রুমাবাঈ যদি কাউকে ভয় করে তো সে এক দেওয়ানজী।

যে বিজনকে দেখলে একদিন সকলেই ভয় পেতো, সে কোনকালেই হাতী ছিল না, দ্বিতীয় কাদায় পড়েছে। সুতরাং অন্য সকলেই আড়ালে টীকা-টিপ্পনি কাটতে শুরু করলো। প্রথম প্রথম আড়ালে, কিছুটা শুনিয়ে শুনিয়েই।

একদিন আবার মেসবাড়িতেই ফিরে এলো বিজন। আগের মতই মেলা-মেশা করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু স্বাভাবিক হতে পারলাম না আমরা। কোথায় যেন চিড় খেয়েছে, জোড়া লাগানো গেল না।

ওকে এড়িয়ে চলতাম। ঘৃণা নয়, কেমন যেন কৌতুক বোধ করতাম ওর কথা উঠলেই। ওর পরাজয় যেন আমাদেরই জয়তিলক।

তবু মনের মধ্যে ঔৎসুক্য গুমরে মরছিল, তাই চেপে রাখতে পারলাম না। একদিন বিজনকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন এমন হলো বল তো বিজন?

বিষণ্ণ হাসি হাসলে ও। বললে, কি জানি। খানিক চুপ করে থেকে বললে, হয়তো মোতিকুমারীর জন্যে।

বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

দুঃখের হাসি হেসে বিজন বললে, মানুষ যে কখন কাকে ঈর্ষা করে!

ঈর্ষা! যেন নিজের মনেরই প্রতিধ্বনি শুনলাম। সত্যিই তো, এই বিজনকেই একদিন ঈর্ষা করতে শুরু করেছিলাম আমরা। ঘৃণা করতাম? হ্যাঁ, ঘৃণা—কিন্তু সে তো ঐ ঈর্ষা থেকেই।

বিজন চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে, সেদিন এক চায়ের আসরে ডেকেছিল রুমা। অনেকে এসেছিল, তার সঙ্গে মেয়েদের ইস্কুলের মাস্টারনী মোতিকুমারী। দেখেছো তুমি তাকে?

– দেখেছি।

বিজন বললে, ওর চেয়ে কুৎসিত কোন মেয়ে চোখে পড়েছে তোমার? পড়ে নি। তাই হয়তো কেউই ওর সঙ্গে কথা বলছিলো না। মেয়েপুরুষ আরো অনেকে ছিল সেদিন, সকলেই গল্পগুজব করছিল, হৈ-হুল্লোড়ে মেতেছিল। আর মোতিকুমারী উপেক্ষিত হয়ে এক কোণে বসে ছিল চুপ করে। অথচ রুমাবাঈয়ের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করার সাহস ছিল না তার। দেখে মায়া হলো, গিয়ে ওর পাশের চেয়ারে বসলাম।

উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম, তারপর?

—তারপর মাঝেসাঝে দেখা হলে দু-একটা কথা বলতাম, হাসি ফুটতো ওর মুখে। ওর হাসি দেখে আমিও যেন খুশী হতাম। সে-কথা বলতাম

রুমাকে। শুনে রুমা একদিন বললে, তুমি ওকে বিয়ে করো...কি জবাব দেবো এ-কথার। বললাম, অসম্ভব। শুনে যে চোখে তাকালো রুমা, সে-চোখ আমি কোনদিন দেখি নি।

—তারপর? যেন্ কোন রোমহর্ষক কাহিনী শুনছি এমনি উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করলাম।

বিজন বললে, তারপর্? তারপর তো তোমরা জানো।

বললাম, রাজী হলি না কেন? রুমাবাঈয়ের খেয়াল, রাজী হলে হয়তো ভুলেও যেতো।

বিষণ্ণ দেখালো বিজনকে। বললে, রাজী হয়েছিলাম। ভয়ে নয়, সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলাম মোতিকুমারীকে। রুমার নির্যাতন যত বাড়তে লাগল ততই যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম মোতিকুমারীর সঙ্গে, তারপর যেদিন বললাম, মোতিকুমারীকে আমি বিয়ে করছি, সেদিন—এই দেখো—

বলে জামাটা তুলে বিজন ওর পিঠটা দেখালে।

শিউরে উঠলাম। ফর্সা পিঠের ওপর গোটাকয়েক কালসিটে দাগ, যেন ক্রোধান্ধ কেউ চাবুকের পর চাবুক বসিয়েছে সেখানে।

বিস্মিত হয়ে তাকালাম, সে কি? কেন?

বিজন হাসলে।—আমি জানতাম ঈর্ষায় জ্বলছে রুমা, কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। অথচ ওর সন্দেহ যে সত্যি তার প্রমাণ না পেলে যেন শান্তি নেই ওর। কিন্তু তোমাকে বলছি আমি, বিশ্বাস করো, রুমার চোখের সামনেই আমি মোতিকুমারীকে বিয়ে করবো। শেষের কথাগুলো এত দৃঢ়তার সঙ্গে বললে ও, যেন নিজের মনকেই বলছে।

বিয়ে সত্যিই হলো একদিন। কিন্তু রুমাবাঈয়ের চোখের সামনে নয়। বাঙালীটোলার কালীবাড়ীতে যখন বিজন আর মোতিকুমারী মন্ত্র উচ্চারণ করছে সেই সময় নিহালের সঙ্গে রুমাবাঈ আকাশবিহারে উঠছেন। আর তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল সেই ডাকোটা বিমানখানায় আগুন লেগেছে। মুহূর্তের মধ্যে রাত্রির আকাশে বিদ্যুৎ জ্বালিয়ে প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে পড়লো প্লেনটা।

ভিড় ছুটলো আনারবাগের ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডটার দিকে। তখনও আগুনের শিখা দুলে দুলে উঠছে কালো আকাশের গায়ে। গুজব ফিরে এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

কিন্তু, না, পরের দিন সকালেই খবর পাওয়া গেল। মারা যান নি

রুমাবাঈ, বাঁচবেন কিনা তাও সন্দেহ। সমস্ত শরীর নাকি ঝলসে গেছে তাঁর, যদি-বা প্রাণে বেঁচে যান তবু চিনতে পারবে না কেউ। হয়তো অন্ধ হয়ে যাবেন, হয়তো পঙ্গু হয়ে কাটাতে হবে সারা জীবন, আগুনে পোড়া কুৎসিত মাংসপিণ্ডের মত।

আমরা সবাই, যারা এতদিন ঘৃণা করে এসেছি, দুর্ণাম রটিয়েছি রুমাবাঈয়ের, কেমন যেন ব্যথা অনুভব করলাম।

আনারবাগ শহরের উজ্জ্বলতম তারা যেন হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে, যে তারার আলো আমাদের মনেও রোমাঞ্চ জাগাতো, যে তারার আলোয় ধাঁধাঁ লাগতো আমদের কল্পনাবিলাসী চোখে।

দিনকয়েক পরে বিজনকে কাছে ডেকে ফিস্‌ফিস্‌ করে প্রশ্ন করলাম, শুনেছিস?

—শুনেছি।

বললাম, একবার দেখা করে আয় বিজন, মৃত্যুর আগে এইটুকু সান্ত্বনা তাকে দিয়ে আয়। এই দুর্ঘটনাই প্রমাণ করলো বিজন, রুমাবাঈ তোকে ভালবাসতো।

অবিশ্বাসের হাসি হাসলে ও। বলছো যখন যাবো। তুমিও চলো।

প্যালেসের এক প্রান্তে সুব্যাপ্ত একটি ফুলের বাগানের মাঝখানে রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের দানে গড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রুমাবাঈকে।

অনুমতি নিয়ে দেখা করতে গেলাম আমি আর বিজন।

একটি ফর্সা ধবধবে রোগশয্যায় সাদা চাদরের মত ম্লান হয়ে পড়ে ছিল রুমাবাঈয়ের অর্ধ অচেতন শরীর। ওষুধের একটা তীব্র দুর্গন্ধ চারিদিকের হাওয়ায়। আর রুমাবাঈয়ের সারা শরীর ব্যাণ্ডেজে মোড়া। সমস্ত মুখ ব্যাণ্ডেজে ঢাকা।

ধীরে ধীরে টুলটায় বসলো বিজন। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে রুমাকে স্পর্শ করতে গিয়ে হাতটা ফিরিয়ে নিলো।

ডাকলে, রুমা!

ঠিক বোঝা গেল না, কি যেন অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এলো রুমাবাঈয়ের মুখ থেকে। একটু বোধ হয় নড়লো ওর শরীরটা।

নার্স ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বিজনের নাম বললে।

রুমাবাঈ ফিস্‌ফিস্‌ করে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ও আসে নি?

—কে? নার্স চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে। —কে রুমাবাঈ?

—রায়, মিস্টার রায়। উত্তর এলো ধীরে স্বরে।

—দেওয়ানজী? উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে বসলাম। —খবর দেবো, ডেকে পাঠাবো রুমাবাঈ?

মরণোন্মুখ একটি নারীর যে কোন শেষ ইচ্ছাকে তৃপ্ত করলে যেন আমিও তখন তৃপ্ত হই।

দীর্ঘশ্বাসের মত ব্যথার কণ্ঠে রুমাবাঈ বললেন, না, না, আমি জানি সে আসবে না।

—আসবে না? বিস্ময়ের স্বরে নার্স প্রতিপ্রশ্ন করলে।

হয়তো ব্যাণ্ডেজের বাঁধনে চাপা পড়ে গেল রুমাবাঈয়ের বিষণ্ণ ম্লান হাসি। —পাথর, পাথর সে, মানুষ নয়। এত ঈর্ষার আগুন জ্বালাতে চেয়েছি বিজন, তবু চোখ ফেরায় নি সে। হেরে গেলাম, হেরে গেলাম আমি।

কোন কথা বললাম না আমরা। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠে এলাম। আর রুমাবাঈয়ের সমস্ত দুর্নাম, সমস্ত হঠকারিতা আর দীপ্ত যৌবনের উদ্দামতায় ঢাকা পড়েছিল যে অতৃপ্ত ভালবাসা, যে ভালবাসা প্রকাশে ভীরু আর লজ্জায় দুর্বল, সেই ভালবাসার উজ্জ্বল শিখাটি হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মন বললে, রুমাবাঈও ভালবাসতে জানে।

এতখানি দুর্বলতা কি করে ঢেকে রেখেছিল রুমাবাঈ, এতখানি অতৃপ্ত বাসনার গায়ে অপবাদের শাল জড়িয়ে রেখেছিল কেন!

বিজনকে সে-কথা জিগ্যেস করবার জন্যে ফিরে তাকালাম হঠাৎ। দেখলাম, বিজনের দুচোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে।

কান্না, কান্না। কিন্তু এ কান্নার খবর রাখলো না কেউ।

অনারবাগের দুর্নামী রটনা শুধুই মোতিকুমারীর বিয়ের সঙ্গে রুমাবাঈয়ের বিমান দুর্ঘটনার যোগাযোগ আবিষ্কাব করে তৃপ্ত হলো।

[১৩৬০]